অনীক

মার্চ ২০১৫
বর্ষ ৫১ □ সংখ্যা ৯
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

গোবিন্দ পানসারিকে খুন করেও স্তব্ধ করা গেল না □ স্বপন শীল □ ২

অভিজিৎ-রা কি এভাবেই মারা যাবেন? □ ফিরোজ আহমেদ □ ৩

দিল্লীতে আপ-এর বিজয় □ মিতা দত্ত □ ৪

প্রতিবাদীদের মৃত্যুমিছিল □ অরিজিৎ □ ৫

প্রবন্ধ

গ্রীস সংকট □ মানস □ ৭

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৫-১৬ □ দীপংকর দে □ ১১

কয়লার বাজারিকরণ এবং কয়লা মজদুরদের চ্যালেঞ্জ □ প্রশান্ত হালদার □ ১৫

দেশটাকে গিলে খাবে জমি অধিগ্রহণ আইন □ প্রণব দে □ ২০

রাশিয়ার ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন □ সুচরিতা সেন □ ২৬

শিক্ষা সংহার— এই আমাদের দেশ □ সমরেশ মিত্র □ ৩৪

স্মরণ

কমরেড অসিত সিনহা □ নিমাই ঘোষ □ ৩৮

বার্ষিক সূচি : ২০১৪ □ ৩৯

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

অন্ধরা যখন চক্ষুষ্মান

মুখ খুললেই খুন, কলম ধরলেই মৃত্যু। স্বাধীন মতপ্রকাশের, ব্যক্তি-স্বাধীনতার এটাই জরিমানা। সলমন রুশদি, তসলিমা নাসরিন ভয়ঙ্কর পরিণতি এখনও পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারলেও, ভারতবর্ষে নরেন্দ্র দাভোলকর, গোভিন্দ্ পানসারে বা বাংলাদেশের অভিজিৎ রায় সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নি। দাভোলকর-পানসারে-অভিজিৎ কোনো নতুন ভাবনার দিশারী ছিলেন না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানকে বাহন করে সমাজে যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনা-চিন্তা প্রসারের প্রয়াস নিয়েছিলেন মাত্র। দাভোলকরের উদ্যোগে মহারাষ্ট্র সরকার ওঝাগিরি-জাদুগিরি প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। পানসারেও ছিলেন দাভোলকরের পথানুসারী। ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাহিতৈষী রাজা হিসাবে শিবাজী সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন মানুষকে ইতিহাস-সচেতন হতে সাহায্য করেছিল। অভিজিৎ শাস্ত্রীয় তথা ধর্মীয় আচার-আচরণগুলির অসাড়তা সম্বন্ধে মানুকে সজাগ করার চেষ্টা করতেন। তিনশো বছর আগে এইসব ভাবনা বা প্রয়াস 'বৈপ্লবিক' বলে পরিগণিত হতো। একবিংশ শতাব্দীতে এতাদৃশ ভাবনায় না আছে অস্বাভাবিকত্ব, না আছে সামাজিক বিকাশের সঙ্গে অসামঞ্জস্য। কিন্তু স্বার্থান্বেষী কিছু শক্তি প্রগতির চাকাকে উল্টোদিকে ঘোরাতে বদ্ধপরিকর। সন্ত্রাস, বলপ্রয়োগ, ভীতিপ্রদর্শন তাদের একমাত্র অস্ত্র। যুক্তিকে পরাস্ত করতে না পেরে তারা কাপুরুষের মতো যুক্তিবাদী মানুষদের হত্যা করার পন্থা বেছে নিয়েছে।

পৃথিবীতে দুই ধরণের প্রতিযোগিতা চলছে। একদিকে পুঁজির মুনাফা কামানোর প্রতিযোগিতা, অপরদিকে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের প্রতিযোগিতা। পুঁজি যত বৃহৎ হচ্ছে, মুনাফা ততই শিখরগামী হচ্ছে। বিপরীতে সাধারণ মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ দুঃসহ পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। নব্বই দশকে নব্য উদারনীতির রথযাত্রা শুরু হওয়ার পর, পুঁজির শোষণ এবং সম্পদ লুণ্ঠন আরও বেশি করে উন্মার্গগামী হয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, মানুষের মধ্যে ক্ষোভ, হতাশা বৃদ্ধি। বিদ্রোহের লক্ষণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মানুষের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ দুর্বল করতে শাসকশ্রেণী চিরকাল ভেদনীতির আশ্রয় নিয়েছে আর এই পরিস্থিতিতে পুষ্টিলাভ করেছে ধর্মীয় মৌলবাদ। মানুষ যখন শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সমবেত সংগ্রামে সামিল হয়েছে, ধর্মগত বিভেদ, জাতিগত বিভেদ সেখানে ঠাঁই পায়নি। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম যেখানে দুর্বল, মানুষ সেখানে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে, পারস্পরিক হানাহানি বেড়েছে।

ভারতবর্ষে নয়া উদারনীতির পত্তন হয়েছে 'বাবরি মসজিদ' ধ্বংসের উপর দাঁড়িয়ে। তারপর থেকে আরএসএস, বজরং দল, হিন্দু মহাসভার হিংসাত্মক কার্যকলাপ যত বৃদ্ধি পেয়েছে, অতীতে তার নজির নেই। ভারতের সংসদীয় মানচিত্রে বিজেপি-র রাজনৈতিক পরিসর যত বৃদ্ধি পেয়েছে, আরএসএস সহ হিন্দু মৌলবাদী দলগুলির দাপাদাপি তত বৃদ্ধি পেয়েছে। খুব পরিকল্পিত পথে, হিন্দুত্ববাদ আর ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো হচ্ছে। টিভি, সংবাদপত্রে বিশাল অঙ্কের বিজ্ঞাপন তার প্রমাণ। সমাজে তার প্রতিক্রিয়াও দেখা দিচ্ছে। বিশেষত নারী সমাজ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

এটা ভাববার কারণ নেই যে, এর পিছনে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট পুঁজির কোনো ভূমিকা নেই। উদারনৈতিক সংস্কারের পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য, সরকারে তাদের যেমন বিজেপি-কে প্রয়োজন, সামাজিক প্রতিরোধের দেওয়াল ভেদ করতে আরএসএস-কেও পাশে পাওয়া তাদের দরকার। তালিবানের জন্ম হয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় মদতে। এশিয়া মহাদেশে মৌলবাদী শক্তির সম্প্রসারণে সাম্রাজ্যবাদ তার ভূমিকা অস্বীকার করবে কোন মুখে?

ঘটনাপ্রবাহ

গোবিন্দ পানসারিকে খুন করেও স্তব্ধ করা গেল না

স্বপন শীল

গোবিন্দ পানসারি ছিলেন জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত এক ব্যক্তিত্ব। সিপিআই-এর সাথে যুক্ত একজন রাজনৈতিক কর্মী হলেও গোবিন্দ পানসারি ক্ষমতার রাজনীতির বৃত্তের বাইরে একজন সমাজকর্মী হিসাবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। এরকম এক ব্যক্তিত্ব মহারাষ্ট্রে কোলাপুরে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন। সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী উমা পানসারি। তিনিও গুলিবিদ্ধ হন। গোবিন্দ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মুম্বাইয়ের ব্রীচক্যান্ডি হাসপাতালে মারা যান। এবং উমা এখনও চিকিৎসাধীন।

খুনিদের গ্রেপ্তার করা এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা যথাক্রমে পুলিশ ও বিচার বিভাগের কাজ। কিন্তু এর মধ্য থেকে খুনের পিছনে কারা বা খুনের নেপথ্য উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা মিলবে না। এই ধারণা পেতে হলে নিহত পানসারির জীবদ্দশায় তাঁর কর্মকাণ্ডের কিছু বিশ্লেষণ সহায়ক হতে পারে।

গোবিন্দর সামাজিক কাজকর্মের পরিধিতে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মৌলবাদ বিরোধিতা। নিছক বক্তৃতা এবং মিছিলে পা মিলিয়ে নয়, তিনি এই কাজটা করতেন মারাঠা আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে। এবিষয়ে তাঁর সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কাজ 'শিবাজী কওন হোতা' শীর্ষক মারাঠা ভাষায় লেখা একখানি বই।

আরএসএস, বিশেষ করে হিন্দিবলয়ে যেমন রামকে জাতীয় বীর হিসেবে তুলে ধরে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে রূপ দিতে সচেষ্ট, মহারাষ্ট্রে তা নয়। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব শিবাজীকে নিয়ে মারাঠাদের একটি আবেগ আছে। যে কোন জাতির ক্ষেত্রেই এরকম আবেগ শুধু স্বাভাবিকই নয়, যৌক্তিকও বটে। কিন্তু আরএসএস মারাঠা জনজীবনের এই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক আবেগকে মুসলিম বিরোধী এক হিংস্র আবেগে পরিণত করে শুরু থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের জমি কর্ষণে সচেষ্ট। শিবসেনাও এই কাজে তার অংশীদার। শিবাজীকে প্রধানত মুঘল বাদশাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁর সাম্রাজ্যকে সংহত ও রক্ষা করতে হয়েছিল। এই বিষয়টাই আরএসএস-এর মুসলিম বিরোধিতার মূলধন। কিন্তু গোবিন্দ তাঁর বইতে তথ্য ও যুক্তি সহকারে অন্য এক শিবাজীকে তুলে ধরেছেন, যে শিবাজী ওইরকম সামন্তযুগেও ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন ধর্মনিরপেক্ষ রাজা। এছাড়া, মাত্র আশি পৃষ্ঠার এই বইয়ে গোবিন্দ শিবাজীর মত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বিভেদমূলক রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেছেন। বইটি যে আরএসএস ও শিবসেনার অপচেষ্টা সত্ত্বেও মারাঠি জনগণের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে তার বড়ো প্রমাণ বইটির অভূতপূর্ব প্রসার। গোবিন্দর জীবদ্দশাতেই বইটি ৩৭বার মুদ্রিত হয়েছে এবং ১,৪২,০০০ মানুষ বইটি কিনে পড়েছেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরদিন ১৭ই ফেব্রুয়ারি একদিনে বইটি বিক্রি হয়েছে ৩০০০ কপি। প্রকাশক ৩৮তম মুদ্রণে আরও ৫০০০ কপি বইয়ের জোগানের ব্যবস্থা করেছেন।

ডঃ নরেন্দ্র দাভোলকারের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালে 'অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি' কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গীকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। গোবিন্দ পানসারি এই সমিতির সদস্য এবং দাভোলকারের সহযোদ্ধা ছিলেন। দাভোলকার মৌলবাদীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ২০শে আগস্ট ২০১৩ নিহত হন। এর কয়েক মাস বাদে গোবিন্দ একটি লিখিত হুমকি পান, যাতে মারাঠা ভাষায় লেখা ছিল— 'তুমকা দাভোলকার করু', অর্থাৎ 'তোমাকে দাভোলকারের মতো খুন করা হবে'। বাস্তবেও দাভোলকারের খুনের প্রক্রিয়া এবং গোবিন্দর খুনের প্রক্রিয়া একই রকম। এই কারণেই নিহত নরেন্দ্র দাভোলকারের ছেলে হামিদ দাভোলকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল যে গোবিন্দ পানসারির খুনিদের ধরা গেলে তাঁর পিতার খুনেরও কিনারা করা সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য, দাভোলকারের খুনিরা এখনও অধরা। মহারাষ্ট্রের পুলিশ দাভোলকারের খুনিদের গ্রেপ্তার করাকে কেন্দ্র করে ছেলেখেলায় নেমেছে। পুলিশ প্ল্যানচেট শুরু করেছে খুনিদের চিহ্নিত করার জন্য। এই ঘটনা জেনে হামিদ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এটা পরিকল্পিতভাবে মৃত দাভোলকারকে অপমানিত করার চেষ্টা, কারণ এ ধরনের কালো ম্যাজিকের বিরুদ্ধেই ছিল দাভোলকারের সংগ্রাম। গোবিন্দর ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

অতএব খুনী কে, এটা অদূর ভবিষ্যতে যদি নাও জানা যায় তাহলেও এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে একটা আদর্শকে, একটা ভাষাকে স্তব্ধ করার জন্য এই খুন। দাভোলকার-গোবিন্দরা যে আদর্শকে বয়ে বেড়াতেন সেই আদর্শের পরিপন্থী মানুষদের দ্বারাই যে খুনীরা পরিচালিত তাও বলার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমান প্রবন্ধে গোবিন্দর সামাজিক কর্মকাণ্ডের একটি দিককেই ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর অন্য অনেক কাজ রয়েছে। গোবিন্দর কাজের এই দিক্‌টা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে গোবিন্দর মুখের ভাষা আজ মহারাষ্ট্রের বহু মানুষের মুখের ভাষায় পরিণত হয়েছে। তাঁর বই পড়ার আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে গোবিন্দর লেখা মৌলবাদ বিরোধী বই কেনবার জন্য এবং বন্ধুদের উপহার দেওয়ার জন্য ছাত্র-যুব-সমাজের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। গোবিন্দ পানসারিকে খুন করা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে স্তব্ধ করা গেল না!

অভিজিৎ-রা কি এভাবেই মারা যাবেন?

ফিরোজ আহমেদ*

আজ থেকে ১১ বছর আগে বইমেলা ফেরত হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলার খবর যখন পেয়েছিলাম, বিশ্বাস করতে পারিনি। বইমেলায়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, এমন ঘটনা ঘটবে, এটা তখন কল্পনার বাইরে ছিল। অভিজিৎ রায়-এর ওপর হামলার খবর শোনা মাত্র অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসেনি, আশঙ্কাটাই বরং নিমেষে তীব্রভাবে গ্রাস করেছে। তখন এটা অবিশ্বাস্য ছিল, এখন এটাকে বাস্তব, সম্ভব বলে মেনে নিয়েছি, এই তো অগ্রগতি।

মাত্র দুই দিন আগে তার সাথে পরিচিত হলাম বইমেলায়, বিজ্ঞানের বইপত্র নিয়ে অনেক আড্ডা হলো। স্মৃতিটুকু এখনো উষ্ণ রয়ে গেছে। মর্মান্তিক এই অনুভূতি ছাপিয়ে কিছু লেখা বা বলা কঠিন। একটা ছবি দেখলাম, রক্তাক্ত বন্যা সাহায্যের জন্য ডাকছেন, আর পেছনে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অভিজিতের লাশ। এই দৃশ্য কোনোদিন যেন ভুলতে না পারি, এই দৃশ্য কাউকে ভুলতে না দেওয়া হোক। এই দৃশ্যের প্রায়শ্চিত্ত না করে আমরা কেউ মুক্ত হতে পারব না, আমাদের জাতি মুক্ত হতে পারবে না।

২

অসহিষ্ণুতা এই রাষ্ট্রে আর সমাজের স্তরে স্তরে টিকিয়ে রাখা হয়েছে, তাকে লালন করা হয়েছে, প্রয়োজন মতো প্রকাশ্য লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, কখনো কখনো গোপন আততায়ী হিসেবে তারা শ্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

রোদেলা প্রকাশনীর স্টল বন্ধ করার বিষয়টা খেয়াল করুন। বেশিরভাগ জাতীয় পত্রিকায় এটা কোনো সংবাদ হয়নি। এর প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশটাও খবর হয়নি। বইমেলাতে আস্ত একটা প্রকাশনীর দোকান বন্ধ করে দেওয়া হলো, বাংলা একাডেমির কর্তাব্যক্তি সাক্ষাৎকার দিয়ে বললেন, আলোচ্য বইটা তিনি পড়েননি, অভিযোগ শুনেছেন! এটা কীভাবে খবর না হয়ে পারল? অথচ মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ ইত্যাদি তো এখানকার গণমাধ্যমের পছন্দের সংবাদ। রোদেলা এই কারণে খবর হয়নি যে এটা সংবাদ হলে যারা বিব্রত হবেন, তাদের বিব্রত করতে চায়নি গণমাধ্যম। হাজার হলেও তো বাংলা একাডেমি 'বাঙালির মননের প্রতীক', বইমেলা মিষ্টি মিষ্টি সব সংবাদের ভান্ডার। সেখানে অপ্রীতিকর কোনো সংবাদকে গুরুত্ব দিতে কিংবা মৌলবাদীদের চক্ষুশূল হতে রাজি না প্রায় কেউ।

এইভাবে কতবড় একটা মাফিয়া চক্র মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে তার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিচ্ছে, কিন্তু বাকিরা দেখেও না দেখার ভান করল, যেন কিছু ঘটেনি। প্রকাশকদের এরা বুঝিয়ে দিল, সব বই প্রকাশ করা যাবে না, লেখকদের জানিয়ে দিল, কোনো লেখায় সে আর নিরাপদ থাকবে না। এই ছকে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে তুমি সংস্কৃতিবান হও, গ্রন্থকীট হও, পুরস্কার জেতো কিংবা সংবাদের শিরোনাম হও। বাংলা একাডেমি, গণমাধ্যম আর বাংলাবাজারের মস্তানরা পরস্পরকে বগলদাবা করে খোদ বইমেলাতে তাদের পরিসর বানিয়ে নিল; বাকিরা দায়সারা প্রতিবাদের আয়োজনে নিজেরা কতটা পিছু হটলেন, তা মাপজোক করা আর হলো না। এর মাঝেই ঘটে গেল অভিজিৎ রায়ের হত্যাকান্ড।

হিজবুত কিংবা শিবিরের তরুণদের কথা ধরুন, এরা কি এই গোটা অসহিষ্ণু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার ফলাফল নয়? এই দেশে প্রতিদিন কমছে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, তার চেয়ে দ্রুতহারে কমছে বিজ্ঞানচেতনা। ব্যবসায় প্রশাসন যে দেশে শিক্ষার প্রায় একমাত্র খাত, রাজনীতি-অর্থনীতি-দর্শন-ইতিহাসের বোধ সে দেশে ক্রমাগত শূন্যই তো হয়ে যাওয়ার কথা। গোপন জঙ্গি সংগঠনগুলোর কথাও ভাবতে পারেন। বাংলাভাইয়ের মতো ব্যক্তি ও সংগঠন গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে, সেটা প্রথম দিন থেকেই পরিষ্কার ছিল। ঘটনার পরম্পরায় বাংলাভাই নিকেশ হয়েছে, কিন্তু এর সাথে রাষ্ট্রের ইন্ধন কীভাবে কাজ করেছে, তার তদন্ত কই, পর্যালোচনা কই?

৩

আমাদের কি তাহলে একটা খাঁচায় আটকে রাখার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না, যেখানে গরিব কৃষক-পোশাকশিল্পের কর্মী আর প্রবাসী শ্রমিকরা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করবেন, করের টাকায় কোষাগার পূর্ণ করবেন, আর সেই টাকা লুট করবে ঋণ খেলাপিরা, লুট করবে উড়াল সেতুর ঠিকাদাররা, লুট করবে আর সব মাফিয়া রাজনীতিবিদরা। তাই নিয়ে হবে তাদের ক্ষমতার কামড়াকামড়ি। আর বাকি জনগণকে আতঙ্কে রাখতে, বশ রাখতে, অনুগত রাখতে টিকিয়ে রাখা হবে, সহ্য করা হবে, মদত দেওয়া হবে এই নারকীয় শক্তিগুলোকে? সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার এই দেশে হচ্ছে না। দেশি-বিদেশি শক্তিগুলোর সাথে মৌলবাদী রাজনীতির গাঁটছড়া নিয়ে কোনো আইন হয়নি। সমাজে অসহিষ্ণুতা যখন খুনের মানসিকতার এত তীব্র বিস্তার ঘটিয়েছে, আপনার বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন্ স্বাভাবিকত্ব নিরাপদ? বিদেশে পালিয়ে যদি রেহাই না পেতে চান, দেশকে যদি রক্ষা করতে চান, উটপাখির মতো বালুতে মুখ গুঁজে থাকবেন না। মৌলবাদ আজকের দুনিয়ায় কোনো রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই লুণ্ঠকদের রাজনীতির পরজীবী। বাংলাদেশের

* লেখক বাংলাদেশের ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মী

শিক্ষা-সংস্কৃতি-মানবিকতার নতুন নির্মাণে অংশ নিন, সাধ্যমতো ভূমিকা রাখুন। লুণ্ঠকদের, মৌলবাদী রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকদের প্রত্যাখ্যান করুন, প্রতিহত করুন।

৪

আমি একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজি, পুলিশ কেন এত কাছে, কয়েক গজ দূরে থেকেও কিছু বলল না। আমি বিশ্বাস করি না যে পুলিশ খুনের অংশ। আমি এটাও বিশ্বাস করি না যে, অভিজিৎ রায়কে পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আদৌ চিনত, তাকে নিয়ে যে এত এত আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ে তারা আদৌ সচেতন ছিল। আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার অদেখা জিরো ডিগ্রি ছবির দৃশ্যের মতো কোনো নারী প্রকাশ্য দিবালোকে কাউকে কুপিয়ে হত্যা করছে, আর পুলিশ আদৌ তাকে ধরারও চেষ্টা করছে না— এতটা বিকারহীন। বহু বিপরীত দৃশ্যের কথা আমরা জানি, যেখানে সাধারণ মানুষ কিংবা পুলিশ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আহতকে রক্ষার কিংবা অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করেছে। একটা বিরাট 'যদি' আছে... অভিজিৎ রায়কে না চেনা পুলিশ যদি মস্ত একটা ভুল করে, যদি একটা মস্ত ভুল বোঝাবুঝি হয়, যদি তারা ভেবে থাকে শিবিরের কাউকে গণপিটুনি দিচ্ছে 'জনতা', কিংবা 'নিজেদের' ভেতরে 'মারামারি' হচ্ছে, ওপরমহলের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়ই তো তাদের থাকার কথা। এর বাইরে অন্য যেকোনো মুহূর্তে তাদের সক্রিয় হওয়ারই কথা।

হয়তো, সেই সুযোগটাই নিয়েছে অভিজিৎ রায়ের খুনি। সেই জন্যই এই নতুন ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধেও দাঁড়ান। খুব স্পষ্ট করে বলুন, যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই, কিন্তু গণতন্ত্রের সাথে তার কোনো বিরোধ নেই। জঙ্গি রাজনীতির উচ্ছেদ চাই, সেটা আইন করে করো, তবে চাপাতি-পিস্তল হাতে গুন্ডাবাহিনী পাঠিয়ে নয়। মৌলবাদ নির্মূলের প্রশ্নে আন্তরিকতা যদি দেখাতে চাও, দুইবেলা খাবারের বন্দোবস্ত সহ সব শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর। খবরদার টাকা নাই বলবা না, এক পুঁজি বাজারে যত টাকা লুট করছ, কিংবা হলমার্কে অথবা উড়াল সেতুতে, এই টাকা তার তুলনায় নস্যি।

৫

অভিজিৎ রায়ের শারীরিক খুনি হয়তো অল্প কজনই। কিন্তু এই খুনের জমিন তৈরি যারা করেছে, তারা সংখ্যায় অল্প নয়। অভিজিৎ রায়ের হত্যাকারীদের অবিলম্বে বিচার চাই। একই সাথে চাই সমাজে-রাষ্ট্রে এই পাপের খাঁচার মূলোৎপাটনের শক্তিরও উদ্বোধন।

দিল্লীতে আপ-এর বিজয়

মিতা দত্ত

সবাই জানেন, বিজেপির বিজয়রথের চাকা থমকে দাঁড়িয়েছে দিল্লীতে। তবে শুধু মোদী-বিজয় নয়, দিল্লীতে আপ-এর জয় তার চেয়ে অনেক বড় কিছু। কারণ আপ যে শুধু বিজেপি-কে প্রায় ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে বা কংগ্রেসকে দিল্লীর রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে তাই নয়, আপ জিতেছে বিজেপি-বিরোধী কোনও হাওয়ায় নয়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। এই নির্বাচনের ইস্যু তৈরি করে দিয়েছে আপ, তাদের বিজয়ও এক অভূতপূর্ব বিজয়। ৭০টির মধ্যে ৬৭টি আসনে জয় এবং এই জয় এসেছে ৫০ শতাংশের অনেক বেশি ভোট পেয়ে।

ভোটের শতাংশের হিসাবটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় যদি দুয়ের বেশি শক্তিশালী দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তবে ৩০-৩৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জেতাটাই দস্তুর। যেমন মোদি-র 'বিশাল' বিজয় এসেছে মাত্র ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও বামফ্রন্টের বা তৃণমূলের 'বিশাল বিজয়', 'আমরা ২৩৫ ওরা ৩৫'— এ সবই সাধারণত হয়েছে অর্ধেকের কম ভোটদাতার ভোট পেয়ে (বামফ্রন্ট একবার ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিল)।

শুধু তাই নয়। আজকের দিনে ভোটে টাকার খেলা চলে বিপুল পরিমাণে। চোঙা ফুঁকে ছোট ছোট সভা করা বা খবরের কাগজের ওপর সস্তা রঙ, দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে লিখে প্রচার করার দিন শেষ। এখন ভোটে লাগে টিভি-তে দামী বিজ্ঞাপন, বিশাল বিশাল ফ্লেক্স, ফোনে নেতার কণ্ঠে ভোট ভিক্ষা, বিমান ও হেলিকপ্টারের সাহায্যে নেতাদের একদিনে গোটা দশেক জনসভায় বক্তৃতা। ভোটের দিন মদ-মুরগি তো আছেই। এর জন্য লাগে বিপুল টাকা পরিমাণ। আপ এই খেলায় মাতে নি।

শুধু টাকা নয়, ভোট মানে রক্তের বন্যা, জায়গা দখল— বলা বাহুল, সশস্ত্র উপায়ে। কিন্তু আপ অস্ত্রের সাহায্য নেয় নি।

ভোট মানে ভোটব্যাংক। হিন্দু ভোটব্যাংক, মুসলিম ভোট ব্যাংক, দলিত ভোটব্যাংক, গ্রামীণ ভোটব্যাংক। এর জন্য সংখ্যালঘু এলাকায় সংখ্যালঘু প্রার্থী, ভোটের আগে মন্দির দর্শন, 'বাবা' বা 'ইমাম'-দের আশীর্বাদ প্রার্থনা। আপ এ পথেও হাঁটে নি। বরং দিল্লীর ইমাম-এর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা।

এই অন্যরকম পথে হেঁটেও ভোট এসেছে। দিল্লীর ৮০ শতাংশ হিন্দু ও ১২ শতাংশ মুসলিমদের বেশিরভাগই ভোট দিয়েছেন আপ-কে। ব্রাহ্মণরা ভোট দিয়েছেন, দলিতরাও। উচ্চবিত্তের ভোট পেয়েছে আপ, ঝোপড়িবাসী গরিবদেরও। তবে সবার কাছে আপ-এর গ্রহণযোগ্যতা একরকম নয়। অর্থনৈতিকভাবে বা সামাজিকভাবে যত ওপরের দিকে যাওয়া যাবে, আপ-এর ভোটের শতাংশ তত কমবে। মুসলিম বা দলিতরা আপ-কে যে পরিমাণ ভোট দিয়েছেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দিয়েছেন তার চেয়ে কম। গরিবরা বা নিম্নবিত্তদের কাছ থেকে আপ যত ভোট পেয়েছে তার চেয়ে অনেক কম ভোট পেয়েছে

উচ্চবিত্ত বা ধনীদের কাছে ভোট পেয়েছে তার চেয়ে অনেক কম। আর এঠা তো সবার জানা যে আমাদের দেশে ধর্মের সঙ্গে , বর্ণের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। শুধু তাই নয়, বয়স্কদের চেয়ে তরুণদের ভোট তারা বেশি পেয়েছে। এই জয় এসেছে একটা আশায় ভর করে।

এই নির্বাচনে আপ আসলে প্রমাণ করে দিল, নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা রাখার ভাবমূর্তি তৈরি করে (যেটা আপ গতবারের নির্বাচনের পর কিছুদিনের রাজত্বে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল), তুলনায় কম টাকা দিয়ে, হিংসার রাজনীতির আশ্রয় না নিয়ে, জাত বা ধর্মের আগুন নিয়ে খেলা না করেও নির্বাচনে জেতা সম্ভব। অবশ্য সারা ভারতে বা বড় রাজ্যগুলিতে এ ধরনের বিজয় সম্ভব কিনা বলা মুশকিল।

এবার আপ-এর জয়ের কারণগুলি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বাইরে থেকে দিল্লী দারুণ ঝকঝকে এক শহর, বিত্তবানদের শহর, ক্ষমতাশালীদের শহর। কিন্তু প্রদীপের নিচেই আছে অন্ধকার। দিল্লীর মধ্যে আছে ৩৬৯টি গ্রাম। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টে দিল্লী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দিল্লীর ৪৯ শতাংশ মানুষ থাকের বস্তি, বেআইনি কলোনি আর ঝুপড়িতে। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, দিল্লীর ২০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে, ৬০ শতাংশ গরিব বা নিম্নবিত্ত। সরকারি হাসপাতালগুলিতে ৪০০০ ডাক্তারের পদ খালি। সরকারি স্কুলগুলি সংখ্যা ও মানের দিক থেকে করুণ অবস্থায়। আর বেসরকারি হাসপাতাল বা স্কুলগুলি ছুঁলেও সাধারণ মানুষের কয়েক মাসের নয়, কয়েক বছরের রোজগার চলে যাবে। নির্ভয়া-কাণ্ডের পর দিল্লীতে মহিলাদের দুরবস্থা নজরে এসেছে। সেখানে ১০০০ পুরুষ প্রতি নারীর সংখ্যা ৮৬৬।

দুর্নীতি রোখার প্রতিশ্রুতি বা জন লোকপাল-এর পাশাপাশি আপ নজর দিয়েছে এই অন্য দিল্লীর দিকে। তারা বলেছে, নেতাদের জীবনযাত্রা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা হবে না। তারা লালবাতি জ্বালিয়ে বা হেলিকপ্টারের চড়ে যাতায়াত করবে না। বলেছে বস্তি উন্নয়নের কথা, নতুন স্কুল কলেজ, প্রচুর পরিমাণ টয়লেট তৈরির কথা। বলেছে যে তারা সরকারি পদে অস্থায়ী কর্মী নয়, স্থায়ী কর্মী নেবে, বলেছে সাফাই কর্মচারীদের সম্মান দেওয়ার কথা।

তবে আপ-এর যে প্রতিশ্রুতিগুলি মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হলো অর্ধেক দামে বিজলি, কম দামে পানি। দিল্লীতে জল কিনে খেতে হয়। বিদ্যুতের বিলের মতো জলের দামও সাধারণ মানুষের কাছে চিন্তার বিষয়। তাই এই প্রতিশ্রুতি (এবং ক্ষমতায় এসেই তা পালন) আপ-কে জনমোহিনী শক্তি দিয়েছে। দিল্লীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত, এদের একটা বড় অংশ স্বনিয়োজিত। ছোট দোকানদার, অটো চালক, ই-রিকসা চালক, গৃহকর্মী ইত্যাদি। এদের কাছে আপ-এর আর একটা দিক খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আপ-এর গতবারের স্বল্পকালীন রাজত্বে পুলিশ বা মস্তান রাজ বেশ ধাক্কা খেয়েছিল। পরিচ্ছন্ন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের কথা সব দল বললেও আপ যে তা করে দেখাতে পারে, এই আশা থেকে তাঁরা দলে দলে ভোট দিয়েছেন আপ- কে।

আপ কতটা করতে পারবে, সেটা পরের কথা। এই নির্বাচনের মূল বার্তা কিন্তু জনতার শক্তিতে। বিজেপি-র দক্ষিণপন্থা ও ধর্মের আগুন নিয়ে খেলা, কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, টাকার খেলা, অস্ত্রের জোর, এগুলির বিরোধিতার পাশাপাশি নতুন শক্তি আপ-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা আশা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন এই অন্ধকার দিনেও।

প্রতিবাদীদের মৃত্যুমিছিল

অরিজিৎ

রাজনৈতিক দলাশ্রিত লুম্পেনরাজ অব্যাহত পরিবর্তনের রাজত্বেও। আশ্রয়দাতা খোদ সরকারি দল তৃণমূল, বকলমে রাজ্য সরকার। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনায় যেমন আমাদের দেশে সরকারি দলের নিশানায় বিদ্ধ হয়েছেন দাভোলকার কিংবা গোবিন্দ পানসারের মতো, কিংবা মুসলিম মৌলবাদের হাতে প্রতিবেশী বাংলাদেশে অভিজিৎ রায়ের মত বিজ্ঞানমনস্করা, তেমন আমাদের রাজ্যে ধর্মের নামে না হলেও 'প্রতিবাদী'রা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়ে চলেছেন।

ফেসবুকে রাজনৈতিক কার্টুন শেয়ার করার অভিযোগে অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে গ্রেপ্তার করা দিয়ে এ সরকার পরিষ্কার করে দিয়েছিল আগামী দিনগুলোতে কী প্রকারের দমনপীড়ন সে চালাবে। দুটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে শিলাদিত্য চৌধুরী এবং ছাত্রী তানিয়া ভরদ্বাজের সরকারের কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রশ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং 'মুখ্যমন্ত্রী' তৎক্ষণাৎ তাদের 'মাওবাদী' বলে ঘোষণা করে আরো পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে এ রাজ্যে সরকারের স্তুতি ছাড়া অন্য কথা বলা বিপজ্জনক। বাস্তবত রাজ্য জুড়ে সিপিএমের কায়দায় দলতন্ত্র কায়েম হয়েছে। আঞ্চলিক ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছে লুম্পেনদের হাতে। তৃণমূলের ছত্রছায়ায় ক্ষমতার আস্ফালন প্রদর্শিত হচ্ছে চিরাচরিত প্রথায় নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানির মাধ্যমে। আক্রান্ত হচ্ছেন প্রতিবাদীরা।

সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার বদলেছে। কিন্তু অপরাধীদের কাজকর্ম বা তাদের রাজনৈতিক আশ্রয়দাতাদের ভূমিকা বদলায়নি। মামলা এগোয়নি, আক্রান্ত নিগৃহীতা ঘর

থেকে বেরোতে পারে না আর অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আজও।

সুটিয়ার বরুণ বিশ্বাস খুন হন ২০১২ সালের ৫ই জুলাই। এই তরুণ শিক্ষক বিগত দশ বছর ধরে এলাকায় একের পর এক ঘটে যাওয়া গণধর্ষণের প্রতিরোধে মঞ্চ তৈরি করে শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছিলেন। বরুণ বিশ্বাস আইকন হয়ে গেলেও খুনের কোনো কিনারা হয়নি।

রিজওয়ানুরকে মনে আছে তো? তার দাদা রুকবানুর এখন তৃণমূলের বিধায়ক। বিধায়কের পাড়াতেই দু বছর আগে এক তরুণীর ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হয়েছিল আমিনুল ইসলাম। তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ ধর্ষককে গ্রেপ্তারের বদলে স্বয়ং পুলিশ আমিনুলের নামে ডাকাতির অভিযোগ এনে নিয়মিত হেনস্থা করতে থাকে, যার ফলস্বরূপ থানার সামনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে আমিনুল।

২০১২-র দোলের দিন ভাগ্নির শ্লীলতাহানি রুখতে গিয়ে খুন হন বিশরপাড়ার অসীম দাস। গ্রেপ্তার এবং সাক্ষ্যদান একপ্রকার এগোলেও ধৃতদের পরিবারের দিক থেকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য টাকা দেওয়ার প্রস্তাব, হুমকি, ভয় দেখানো, বাড়িতে আক্রমণ চালানো চলছে— সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করছে পরিবারটি।

বিগত বছরগুলোতে এ ধরনের ঘটনাবলীর মধ্যে সমাজে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটতে পেরেছে কামদুনির ঘটনা। ২০১৩-র ৭ই জুন। ভেড়ির দুনম্বরি কাঁচা পয়সায় প্রশাসনকে কার্যত পকেটে রাখা এবং সরকারি দলের আশ্রয়ে থাকার মিশেল যে বিপুল রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দেয় তারই মূর্তরূপ কামদুনি। ধরাকে সরা জ্ঞান করা এই নব্য মস্তানরাই এখানে প্রভু— তাদের প্রয়োজনেই বিধায়ক এলাকায় ঘাঁটি গাড়ে, মুখ্যমন্ত্রী এলাকায় অবতীর্ণ হন প্রতিবাদীদের শাসাতে কিংবা ৩৬৫ *দিন* কাগজটি কুৎসা ঘাঁটতে শুরু করে প্রতিবাদীদের। মাথায় রাখবেন, আগের জমানায় এরা ছিল সিপিআই(এম)-এর সেই বিখ্যাত মাস্টারের খাস লোক। গণতান্ত্রিক দেশে ধর্ষকদের শুধু আড়াল করা নয় ধর্ষকদের পক্ষে বলার এতো আয়োজন দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। ধর্ষণ করে হত্যার প্রতিকার স্বরূপ পাওয়া গেছে মৃতার ভাই-এর একটা চাকরি, তাও এত চিৎকার-চেঁচামেচির পর মুখ বন্ধ করতে।

এরই মধ্যে গত বছর জুলাই মাসে দত্তপুকুরে খুন হয়েছে কলেজ ছাত্র সৌরভ চৌধুরী। এলাকার সমাজবিরোধী কাজকর্মের প্রতিবাদের জন্যই খুন হয় সে। অতি সাম্প্রতিক ঘটনাটি হাওড়া শালকিয়ার অরূপ ভাণ্ডারীর। গত মাসে সরস্বতী পুজোর বিসর্জনে যাওয়ার সময় একটি তরুণীকে কটূক্তি করে কয়েকজন; অরূপ ভাণ্ডারী তার প্রতিবাদ করলে বচসা বেঁধে যায়, বচসা তৎক্ষণাৎ মিটে গেলেও বিসর্জন সেরে ফেরার তারা অরূপ ও তার এক বন্ধুকে লাঠি-বাঁশ দিয়ে পেটায়। পাঁচদিন কোমায় থাকার পর মৃত্যু হয় অরূপের। কোমায় থাকার দিনগুলোতেও রাজ্য সরকার কিংবা প্রশাসনের কোনো হেলদোল ছিল না, মৃত্যুর পর রাজনৈতিক আলোচনায় বিষয়টা বেশি গুরুত্ব পাওয়ায় এবং একদিনের সফল হাওড়া বন্‌ধ হওয়ায় প্রশাসন খানিক সক্রিয় হয়েছে।

আজ যখন গোটা সমাজ জুড়ে একলা বাঁচার আদর্শ গ্রাস করছে যুবসমাজকে, তখন এ ধরনের প্রতিবাদী চরিত্র সরকার বা প্রশাসনের কাছে অবাঞ্ছিত হলেও সমাজসচেতন এবং আন্দোলনের কর্মীদের কাছে প্রতীকস্বরূপ হওয়া উচিত।

মেয়েদের ওপর জুলুম, অত্যাচার বন্ধ কেবল শাস্তি দিয়ে করা সম্ভব কিনা এ নিয়ে যখন বিদগ্ধ মহলে আলোচনা চলছে তখন বাস্তবের মাটিতে দেখা যাচ্ছে অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরোচ্ছে, প্রতিবাদীদের আক্রান্ত হতে হচ্ছে। তীব্র রাজনৈতিক ইস্যু না হলে ন্যূনতম তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। মদ্যপ এমপি তাপস প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণাই করে দিল, বিরোধীদের ঘরে ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে রেপ করাবে। এ হেন বাস্তবতায় সাধারণ মানুষের এই উপলব্ধি হচ্ছে যে প্রতিবাদ করলে খুন বা নিগৃহীত হতে হবে। মানুষ ভাবছেন, দেশে আইন নেই বলে সমাজবিরোধীরা বাড়ছে, বা দোষীর শাস্তি না পেলে এ ট্র্যাডিশন চলতে থাকবে, আর সরকার এ ঘটনাগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, লঘু করে দেখছে বলেই এরকম ঘটনা বাড়ছে। কিছু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে অন্তত সমাজবিরোধী কাজ করার আগে এরা একটু ভাববে। আরো সচেতন একটা অংশ চিন্তিত হচ্ছেন, রাস্তাঘাটে এরকম অন্যায় হলে সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যাবে?

আমরা জানি, এরকম একটা অনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রশ্ন না করে, পাল্টে না ফেললে এ ধরনের অপরাধকে বন্ধ করা যাবে না; নৈতিকতা বিবর্জিত অর্থনীতি সাধারণভাবে এমনই এক ক্ষমতার জন্ম দেয় যা এধরনের অপরাধ ঘটাতে সচেতন বা অচেতন ইন্ধন যোগায়। সে কথা শাসক শ্রেণীও বোঝে, তাই হয়তো এ হেন অপরাধের উৎস সন্ধান আর তাকে সমূলে উৎপাটন করার ব্যাপারে তারা তৎপর হয় না। কিন্তু এ ব্যবস্থাটাকেও ঠিকমতো চালানোর জন্য অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটে গেলে সেই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখিয়ে কিছু প্রতিকারমূলক ও কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া শাসকের কাছে প্রত্যাশিত। এ সরকার তো তার উল্টোপথে হাঁটছে। এই দৃশ্যগুলোর টুকরো টুকরো ছবি এটুকু অন্তত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, নির্যাতন আর প্রতিহিংসার ঘটনাগুলো ধারাবাহিক, কিন্তু প্রতিবাদগুলো (এমনকি প্রতিবাদীরাও) বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, এবং আমাদের আশপাশটা এমন একটা বিষয়ের নিরিখে রাজনৈতিকভাবে ভীষণ কম সক্রিয়।

পাশাপাশি, অরূপ ভাণ্ডারীরা বারবার আক্রান্ত হয়ে প্রমাণ করছেন, প্রতিবাদীদের মৃত্যু নেই।

প্রবন্ধ

গ্রীস সংকট

মানস

ইলিয়াড হয়তো লেখাই হতো না যদি তখন কোন সংকট না থাকত... ওডিসির প্রসঙ্গেও কবিরা এক সংকটপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়েই বিকাশ লাভ করেন। — ডিনস সিওটিস, ২০১৪

সত্য সেলুকাস বড় বিচিত্র এই দেশ! না রয়েছে সেই সেলুকাস, না আছেন মেগাস্থিনিস, নেই সেই গ্রীস দেশও। বহু বছর আগে সেলুকাস যে দেশটিকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন আজ সেই দেশের নাগরিক হয়ে গ্রীস দেশটির অবস্থা দেখে আমরা যারপরনাই বিস্মিত। আজ থেকে দশ বছর আগেই যে দেশ বর্ণাঢ্য অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করল যে দেশের জনগণ বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দেই দিন গুজরান করছিলেন ২০০৮ পর্যন্ত, তার আজ এই অবস্থা হবে একথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

কী অবস্থা? আজকের গ্রীসের চেহারাটা ঠিক কীরকম? এক নজরে তা দেখে নেওয়া যাক বিস্তারিত আলোচনায় ঢোকার আগে। গত ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে পেনশন কমানো হয়েছে ১২ বার, অবসরের সময়কাল বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়েছে ৬৭ বছর, অর্থাৎ ৬৭ বছরের আগে কেউ অবসর নিতে পারবেন না। অন্যদিকে দেশে বর্তমানে যুবকদের মধ্যে কর্মহীনতার পরিমাণ শতকরা ৬০ শতাংশ। এছাড়া ভ্যাট বারংবার বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৩ শতাংশ, জ্বালানির ওপর প্রভূত মাত্রায় কর বসানো হয়েছে, আয় এবং সম্পত্তির ওপর বসেছে মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা। গ্রীসের এক কবি ব্যঙ্গ করে লিখেছেন যে,

চেপে কর বসাও সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের ওপর, দেখো—
বেবি ফুড আর প্রাণদায়ী ওষুধও যেন বাদ না যায়, আর হ্যাঁ
সমাজে প্রেম ভালোবাসার যে 'ইন্টারেস্ট'
তার ওপরও যুক্ত-মূল্য কর বসাতে ভুলে যেওনা।

এই বীভৎস অর্থনৈতিক অবস্থার সাথেই গ্রীসের সমাজে দেখা দিয়েছে এক অভূতপূর্ব নৈরাজ্য— নিত্যনৈমিত্তিক দাঙ্গা, পুলিশ বাহিনীর অত্যাচার, হরতাল, বন্ধ, এবং *গোল্ডেন ডন* নামে একটি নব্য নাৎসি পার্টির উত্থান।

যত দূরেই যাই, গ্রীস আহত করে আমায়—
গ্রীসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গ্রীসের বর্তমান সংকটকে বুঝতে হলে আমাদের আগে গ্রীসের ইতিহাস সংক্ষেপে জেনে নিতে হবে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে গ্রীস পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলির মতো অষ্টাদশ শতকের নবজাগরণ অথবা শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠেনি। বরং গ্রীসে বহুদিন পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল অটোমান রাজশক্তি। ফলে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক জুড়ে যখন ইংল্যান্ডে স্থাপিত হয়েছিল ধনতন্ত্রের ভিত্তিভূমি, তখনও গ্রীস ছিল এক সামন্ততান্ত্রিক শাসনের পদানত। অর্থাৎ একদিকে যখন ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের অতিদ্রুত বিকাশ ঘটেছিল তুলনায় গ্রীস রয়ে গিয়েছিল শক্তিশালী অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায়। অবশেষে ১৮২০-র দশকে স্বাধীনতার সংগ্রামের দাপটে গ্রীসে অটোমান রাজত্বের পতন ঘটে। অন্যদিকে ততদিনে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব (১৭৬০-১৮৩০) হয়ে গেছে। অর্থাৎ আজকের দিনে যখন বলা হয় গ্রীস ইউরোপের থেকে অনেকটা পিছিয়ে, তার ব্যাখ্যাটি পাওয়া যাবে গ্রীসের ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যেই।

এই যে ইউরোপের উন্নত দেশগুলির সাথে গ্রীসের সংঘাত এটি বুঝতে গেলে আমরা ঘরের কাছের একটি উদাহরণ নিতে পারি, এতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ভারতের নবীনতম রাজ্য তেলেঙ্গানার সৃষ্টিরহস্যের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঐতিহাসিক ভাবে হায়দ্রাবাদ সমেত তেলেঙ্গানা ছিল নিজাম বংশের অত্যাচারী শাসনের অধীন। ফলত তেলেঙ্গানায় প্রতিষ্ঠিত ছিল এক প্রবল শক্তিশালী সামন্ততান্ত্রিক শাসন, যার ফলে পুঁজিবাদ সেখানে বিকাশ লাভ করে নি। অন্যদিকে ব্রিটিশদের অধীনে থাকা অন্ধ্র উপকূল যার মধ্যে পড়ে বিশাখাপত্তনম, সেখানে পুঁজিবাদী কৃষির বিকাশ ঘটে। ফলে ঐতিহাসিক ভাবেই দুটি স্থানে দুই ভিন্ন পথে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল। এবং এরপর যখন জোর করে ১৯৫৬ সালে এই দুটিকে মিশিয়ে দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ তৈরি করা হয়, তখন তেলে-জলে খাপ খায় না। সমস্যা চলতেই থাকে, যার পরিণতি ২০১৪-তে এসে নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানা। একইভাবে গ্রীসেরও ঐতিহাসিক বিকাশের পথ তাকে ইউরোপের বাকি উন্নত দেশগুলির থেকে আলাদা করে দেয়। এমতাবস্থায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তৈরি বা ইউরো চালু করে দেওয়া খানিকটা যেন জোর করেই তেলে-জলে মিশ খাওয়ানোর চেষ্টার মত মনে হয়। আসবো সেকথায়—ইউরো এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সংক্রান্ত আলোচনায়— খানিক পরে। তার আগে গ্রীসের সাম্প্রতিক ইতিহাসেরও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

১৮২০-র দশকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা অর্জন করলেও প্রথম থেকেই এই নতুন গ্রীস রাষ্ট্র অস্থিরতার মধ্যে দিয়েই চলেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা গ্রীসের সমাজকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। ১৮২০-র দশকে স্বাধীনতা অর্জনের পরে গ্রীসের প্রথম

গভর্নর ১৮৩১ সালে এক শক্তিশালী গোষ্ঠীর স্বার্থে খুন হন। তখন থেকেই গ্রীসের রাজনীতিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির বা গোষ্ঠীর ব্যাপক প্রভাব। এবং এরই ফলস্বরূপ ব্যাপকভাবে 'ক্লায়েন্ট বেসড পলিটিক্স' বা 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি' এবং তারই হাত ধরে আসে ব্যাপক দুর্নীতি যা গ্রীসকে রাজনৈতিকভাবে বাকি উন্নত ইউরোপিয়ান দেশগুলির থেকে আলাদা করেছে।

গ্রীসের বিচিত্র ইতিহাসে ডুব দেওয়ার অবকাশ ও পরিসর এ লেখায় নেই। তাই অনেকটা লাফ দিয়ে একশ বছর পার করে ১৮৩১ থেকে চলে আসা যাক একেবারে ১৯৪১ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে পুরোদমে। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখার মতন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত গ্রীস অক্ষশক্তি, অর্থাৎ জার্মানি-ইতালি-বুলগেরিয়ার দখলে ছিল। এই সময় এক ভয়াবহ দুর্দশার সম্মুখীন হয় গ্রীস সমাজ। শুধুমাত্র এথেন্সেই ৪০,০০০ সাধারণ মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছিলেন। এছাড়াও আরও হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন নাৎসি বাহিনী ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের অত্যাচারে। এছাড়া গ্রীসের অর্থনীতি একবার ভেঙ্গে পড়ে এই সময়। এমতাবস্থায় গ্রীসের কমিউনিস্ট এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে শুরু হয় এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। এতদিন অক্ষশক্তির পদানত থাকার পর আবার ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত গ্রীস এই গৃহযুদ্ধে পর্যুদস্ত থাকে। শেষে মার্কিন সহায়তায় জাতীয়তা-বাদীদের জয় হয় এবং ১৯৪৯ সালে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়।

মনে রাখতে হবে এই সময়কাল ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল। তাই গৃহযুদ্ধ শেষে কমিউনিস্টদের প্রবল হেনস্থা শুরু হয়। এবং আবার ১৯৬৭ সালে গ্রীস সামরিক কর্নেলদের প্রভাবে গ্রীসে মিলিটারি একনায়কতন্ত্রী শাসন চালু হয় এবং এর ফলে গ্রীস তৎকালীন ইউরোপের ঐক্যের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। এরপর ১৯৭৪ সালে মিলিটারি শাসনের অবসান ঘটে প্রবল জনরোষের চাপে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। এরপর থেকে গ্রীসে দুই পার্টির গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হয় এবং এই দুই পার্টি ছিল *পাসক* (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক) এবং নিউ ডেমোক্রেসি (সেন্টার রাইট)। এরপর গ্রীস কালক্রমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হয়ে ওঠে।

গ্রীসের অর্থনৈতিক সংকট

তুমি এটাকে যুদ্ধ মনে করোনা তাই না?
কারণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রক্ত পড়ে নেই,
আহতদের হাত-পা ছিটকে গিয়ে আর্তনাদরত
অবস্থায় পরে থাকতে দেখা যাচ্ছে না,
যুদ্ধ
আমি বলি আজকের এটাই যুদ্ধ—
এ যুদ্ধে কোন অস্ত্রসজ্জা দেখা যাবে না,
শোনা যাবে না একটি বুলেটের শব্দও
তবুও এটাই আজকের যুদ্ধ—
এর জেনারেল-মেজর-কর্নেলরা হলেন
ওই খয়েরি স্যুট—আর সাদা কলারেরা
আর অত্যাধুনিক কম্পিউটারগুলোই হল মেশিনগান।

জর্জ দউয়াতজি (২০১০)

আজকের গ্রীসের এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটের মূলত তিনরকমের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথমত, পশ্চিমা মিডিয়া এবং ধনতন্ত্রের প্রতিভূরা এই সংকটের জন্য গ্রীকদের আলস্য, অমিতব্যয়িতার অভ্যাস ইত্যাদিকেই দায়ী করেছেন। ওনাদের সহজ কথা, গ্রীস ঋণ করে ঘি খেয়ে এবার সেই ঋণ শোধ করতে পারছে না। তাই এবার বাগবিতণ্ডা ছেড়ে আমরা যা বলছি সেটা মানুক। এবং এর পরেই ওনারা ব্যয় সংকোচনের নীতিকে চাপিয়ে দিচ্ছেন গ্রীসের ওপর। এই ধরনের একটি অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা এনারা, অর্থাৎ জার্মানি ও পশ্চিমা পুঁজিপতি এবং তাদের পোষা মিডিয়া চালিয়েই যাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, কেইনসিয়ান বা র‍্যাডিকালদের মধ্যে একদলের বক্তব্য, এই সংকট তৈরি হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং গ্রীস সরকারের কিছু ভুল পলিসি বা নীতির জন্য এবং এর সাথে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ঠিকঠাক না হওয়ার দরুন। তৃতীয়ত, মার্কসবাদীদের মতে এই সংকট হলো একটি সিস্টেমিক ব্যাধি, যা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার একটি অংশ। সংকট বিনা পুঁজিবাদ হয় না। এ লেখাটিতে আমরা গ্রীসের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদের সংকটের স্বরূপগুলি আলোচনা করব।

মুনাফার হার জনিত ব্যাখ্যা

মার্কসবাদীদের মধ্যে একদলের মতে পুঁজিবাদের সংকটকে বুঝতে হলে আমাদের নজর রাখতে হবে মুনাফার হারের ওপর। এক্ষেত্রে মূলত আলোচনা করা হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

রেখচিত্র - ১ : মুনাফার হার

পরবর্তীকালের (১৯৫৬-২০০৯) গ্রীসের অর্থনীতিতে মুনাফার হার নিয়ে। রেখচিত্র-১ ও ২ থেকে একথা স্পষ্ট যে, ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৪, এই পর্বে মুনাফার হার মোটামুটি একইরকম ছিল। এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হলো, মুনাফার হার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় মিলিটারি শাসন বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পর্বে। পৃথিবীর ইতিহাসের এ এক অদ্ভুত পরিহাস। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকালে অনেক সময়ই বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে মুনাফার হারের প্রভূত উন্নতি এবং ব্যাপক আর্থিক বৃদ্ধি। স্পেনে স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কোর শাসনকালে, কিংবা ডোমিনিকান রিপাবলিকের ত্রুজিল মলিনার শাসনকালে এই ছবিটিই দেখা গেছে (রেখচিত্র-২)।

১৯৭৪ সালে গ্রীসে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

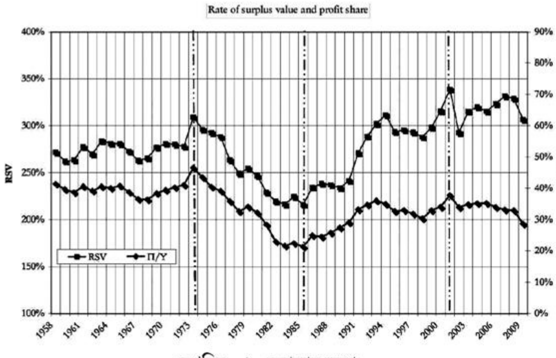

রেখচিত্র - ২ : মুনাফার অংশ

এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ফলত শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭৪-র পর থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকৃত মজুরির হারে গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটে। রেখচিত্র-৩ থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

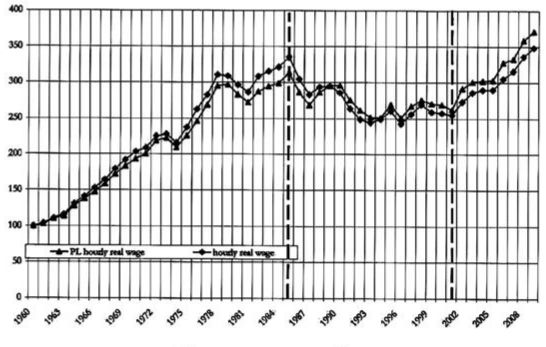

রেখচিত্র - ৩ : প্রকৃত আয়ের বিকাশ

১৯৮৫, অর্থাৎ *পাসক* বা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলটির শাসনের প্রথম পর্যায়টি শেষ হওয়া অবধি এইভাবেই চলে। এরপর ১৯৮৫ সালে পুনর্বার নির্বাচিত হয়ে এসে *পাসক* দলটি গ্রীসের ইতিহাসে সেই প্রথম নিও-লিবারাল নীতির প্রণয়ন শুরু করে। সংক্ষেপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গ্রীসের অর্থনীতিকে পুঁজির বিকাশের দিক থেকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়— (১) সুবর্ণ যুগ— ১৯৫৮-১৯৭৪, এই সময় গ্রীসে অর্থনীতিতে পুঁজির সঞ্চয়ন এবং মুনাফার হারের বৃদ্ধি ঘটেছিল অতি দ্রুত হারে; (২) বন্ধ্যা দশা—১৯৭৪-১৯৮৫, এই সময় মুনাফার হারের হ্রাস ঘটে আর প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি ঘটে এবং পুঁজির বিকাশ থমকে যায়; (৩) নিও-লিবারাল দশা— ১৯৮৬-২০০৭, এই পর্যায়ে মুনাফার হারের কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে এবং পুঁজির বিকাশ খানিকটা ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু এই নিও-লিবারাল দশায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শ্রমিকদের শক্তি আরও হ্রাস পায়, শ্রমিকদের অধিকার আরও একবার খর্ব করা হয় ইত্যাদি। এরপর ২০০৯ থেকে গ্রীস অর্থনীতি সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সংক্ষেপে এই হল গ্রীসের অর্থনীতির একটি দীর্ঘকালীন বিকাশের আলোচনা (রেখচিত্র-৪)।

মুনাফার হার সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় দেখানো যায় যে, ১৯৭০ এর পর থেকে গ্রীসে যে বন্ধ্যাদশার সৃষ্টি হয়, ১৯৭০-এর দশকের মৃদু সংকটের পরেও তা পুরোপুরি ঠিক হয়নি। মার্কসীয় মতে ধনতন্ত্রের প্রতিটি সংকট কাটিয়ে ওঠার পরে অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়াবার কথা। এমনকি এই বন্ধ্যাদশা কাটানোর জন্য যে নিও-লিবারাল নীতির অবতারণা, তার ফলেও মুনাফার হার এবং পুঁজির বিকাশের কাঙ্খিত উন্নতি লাভ হয়নি ১৯৯০-এর দশকেও। যেহেতু উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুনাফার হার কম তাই অর্থনীতির একটি নতুন ক্ষেত্র বিকাশ লাভ করে— এই ক্ষেত্রটি হল ফিনান্স বা ফাটকা পুঁজির ক্ষেত্র। স্টক মার্কেট বা শেয়ার বাজারে অলীক বুদবুদ তৈরি করে, মানুষকে লোভ দেখিয়ে এক অন্যরকম অর্থনীতির মধ্যে ঢুকে পড়ে গ্রীস। যে অর্থনীতিতে পুতুল নাচের সুতোগুলি চলে যায় এই ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্রের রথী-মহারথীদের হাতে। সস্তায় ঋণ প্রদান বেড়ে যায় অভাবনীয় ভাবে। রেখচিত্র-৪-এ এটিই দেখানো হয়েছে। অতএব এই অতিরিক্ত ঋণ-জর্জর অবস্থার একটি মার্কসীয় ব্যাখ্যা উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

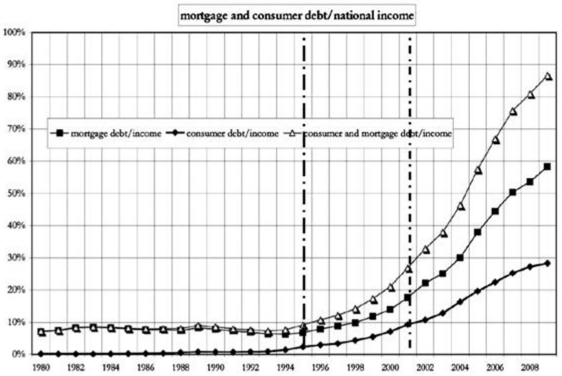

রেখচিত্র - ৪ : ঋণের পরিমাণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি

অন্যান্য মার্কসীয় ব্যাখ্যা

জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপিয়ানরা বলছেন যে গ্রীস অতিরিক্ত ঋণ করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা যদি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়? শ্লাভজ জিজেক, বিখ্যাত মার্কসীয় দার্শনিক এই কাজটিই করেছেন। উনি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, গ্রীসকে এতো এতো ইউরো ঋণ কেন দেওয়া হলো, যখন অনেক দিন আগে থাকতেই বোঝা যাচ্ছিল যে গ্রীসের পক্ষে এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়? এর কারণ হিসেবে উনি বলেছেন যে, ঋণ প্রদান এবং ঋণে জর্জরিত করে একটা দেশকে পদানত করে রাখা হলো আজকের পুঁজিবাদী সমাজের পুঁজির বিকাশের এবং পুঁজির আধিপত্য বজায় রাখার এক অন্যতম শর্ত। জিজেক দেখিয়েছেন যে এর আগে যখন আর্জেন্তিনা তার ঋণ সময়ের আগেই শোধ দিয়ে দেয় তখন ঋণদাতা আইএমএফ বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, আর্জেন্তিনা আইএমএফ-এর কথা মেনে চলেনি। তার মানে হল আজকের পৃথিবীতে 'সভেরিন ডেট' বা রাষ্ট্রকে দেওয়া ঋণগুলো দেওয়াই হয় শোধ না পাওয়ার জন্য। কারণ রাষ্ট্র ঋণ শোধে অপারগ হলেই পুঁজিবাদীরা সেই রাষ্ট্রকে পদানত করে নিজের অন্যায় দাবিগুলো চাপিয়ে দিতে পারবে। গ্রীসে এখন এটাই হয়েছে। গত পাঁচ বছরে ব্যয় সংকোচনের নীতি জোর করে চাপিয়ে গ্রীসের সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে দেওয়া হয়েছে।

***সিরিজা* ও বামপন্থার উত্থান**

২০১৫-র জানুয়ারি বিশ্বের বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষে সুখবর নিয়ে এল। গ্রীসে ক্ষমতায় এলো বামপন্থী *সিরিজা* পার্টি। আমাদের দেশে দক্ষিণপন্থার প্রবল উত্থান এবং বামপন্থার সংকটের মুহূর্তে এখবর নিঃসন্দেহ খানিক স্বস্তিদায়ক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কীভাবে কোন্ পরিস্থিতিতে *সিরিজা*-র মতন একটি নতুন বাম শক্তি গ্রীসে ক্ষমতায়। বর্তমান ইউরোপের অবস্থার দিকে যদি তাকাই তাহলে কী দেখবো? আমরা দেখতে পাব বেশিরভাগ দেশগুলিরই বিধ্বস্ত অবস্থা। যে দেশগুলির অর্থনীতির অবস্থা শোচনীয় তার মধ্যে আছে গ্রীস, স্পেন ইত্যাদি, পর্তুগাল এবং ফ্রান্স। এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে করুণ অবস্থা গ্রীসের। বিশেষ করে ২০১০-র পরে— ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক, আইএমএফ— এই তিন শক্তির দেওয়া দাওয়াইয়ের ফলে গ্রীসের অবস্থা আরও চরমে ওঠে।

আজকের গ্রীসে শতকরা ষাট ভাগ যুবা বেকারত্বের কবলে, পেনশনভোগীরা আক্রান্ত, সামাজিক সুরক্ষা প্রবলভাবে বিপর্যস্ত। উপরোক্ত ত্রিশক্তির প্রভাবে গ্রিসের সরকার যে 'অস্টারিটি' নীতি বা ব্যয় সংকোচনের নীতি ২০১০ সাল থেকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তাতে পরবর্তী বছর গুলিতে গ্রীসের অর্থনীতিতে বৃদ্ধি হয় ঋণাত্মক। অর্থাৎ গ্রীসের অর্থনীতির ক্রমশ সংকোচন ঘটে। এই প্রায় মাৎস্যন্যায় অবস্থার থেকে পরিত্রাণ পেতেই গ্রীসের জনগণ *সিরিজা* পার্টিকে বেছে নিয়েছে, যারা কিনা এই ব্যয় সংকোচনের নীতিকে বরাবর সমালোচনা করে এসেছে।

এই ঘটনাটির সাপেক্ষে আমাদের প্রণিধানযোগ্য বিষয়গুলি হলো—

প্রথমত, আমাদের মনে রাখতে হবে যে গ্রীসে এই বামপন্থার উত্থান হয়েছে এক অভূতপূর্ব সংকটের মুহূর্তে। ধনতন্ত্র সেদেশে তথা পশ্চিম ইউরোপের অনেকগুলি দেশেই প্রবল সংকটের মুখোমুখী। অতএব বামপন্থার উত্থানের একটি শক্তিশালী পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়েছে সেদেশে। দ্বিতীয়ত, *সিরিজা*-র ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে *সিরিজা*-র মূল ইস্যু ছিল মূলত দুটি— (১) দুর্নীতি, এবং (২) সমাজের ওপরতলার মানুষ, অর্থাৎ শিল্পপতিদের কর ফাঁকি। এই দুটি মূল ইস্যুর ওপর ভিত্তি করেই *সিরিজা*-র জয়। আমাদের দেশের বামপন্থী শক্তিগুলিরও ভাবার সুযোগ রয়েছে যে নির্বাচন লড়ার ক্ষেত্রে কোন ইস্যুগুলি বাছবো। দ্বিতীয়ত, *সিরিজা*-র জয়টি অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সামনের রাস্তায় কাঁটা রয়েছে অনেক। ২০১০ সালে গ্রীস ঋণ শোধে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই দেশবাসীকে ব্যয় সংকোচনের কবলে পড়তে হয়। এই ঋণ-জনিত সমস্যা কিন্তু এখনও মেটেনি। ফলে গ্রীসের এই নতুন সরকারকেও ওই ত্রিশক্তির— ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন,

এর পর ১৪ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৫-১৬

দীপংকর দে

অর্থমন্ত্রী জেটলি সাহেবের এটা দ্বিতীয় বাজেট। যদিও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থায় ও ভারতে পরিকল্পনা কমিশন বিলুপ্তির পর বাজেট তার পূর্ব কৌলীন্য হারিয়েছে, তবু বুদ্ধিজীবী মহলে বাজেট নিয়ে চর্চার পুরনো অভ্যাসটা এখনও বিলুপ্ত হয় নি। তবে চর্চার অভিমুখ কর ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে আরও একটু বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে।

আমরা প্রথমে দেখে নেব, এ বাজেটে সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য পণ্যে কী কী উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। (নিন্দুকেরা বলে, এগুলি নাকি দিল্লী বিধানসভা ভোটের সুফল!)

১) দেশের এক বড় অংশের নাগরিকদের জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমা ও দুর্ঘটনা বিমা নেই। গরিব মানুষ যাতে এগুলির আওতায় আসতে পারেন, সে জন্য বছরে ১২ টাকা প্রিমিয়ামে 'প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা' চালু করা হবে। নিঃসন্দেহে সাধু প্রস্তাব।

২) মহিলাদের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি।

৩) গ্রামের ছেলেমেয়েরাও যাতে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পান সে জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে শুরু হচ্ছে 'দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা'। (তবে ভয় হয়, এবার গ্রামীণ যুবকরা হয়ত বুনিয়াদি জ্ঞানটাই ভুলে যাবে— 'উন্নত মানের বীজ' যেভাবে বিলুপ্তি ঘটিয়েছে স্থানীয় দেশজ বীজ ও কৃষি-জ্ঞানের।)

৪) পিপিএফ-এর বেওয়ারিশ ৩০০০ কোটি টাকা ও ইপিএফ-এর ৬০০০ কোটি টাকা দিয়ে প্রবীণদের জন্য একটি তহবিল গড়ে তোলা হচ্ছে।

৫) 'অটল পেনশন যোজনা' ঘোষণা। যারা চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নাম লেখাবেন তাদের সরকার সহায়তা হিসেবে সর্বাধিক ১০০০ টাকা পর্যন্ত পেনশন দেবে।

দুই

এবার আমরা একটু মন্দ কথা বলব। সরকারের বিভিন্ন দাবির সারবত্তা নিয়ে একটু আলোচনা করব।

ক) দাবি : দেশের অর্থব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়িয়েছে— জাতীয় উৎপাদন বাড়ছে এবং আগামী আর্থিক বছরে (২০১৫-১৬) বৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়াবে ৭.৪%।

বিশ্বের তাবড় অর্থনীতিবিদরা প্রথমে একটু থমকে গেলেও পরিসংখ্যানের কারিকুরি তাঁরা ধরে ফেলেছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন— বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা (উৎপাদন ক্ষমতা) বাড়ল না, তবে অর্থনীতির কোন্ নিয়মে বৃদ্ধির হার বাড়ল? পরে জানা গেল, আসলে এটা লোক-দেখানো। বৃদ্ধির ফাঁকিবাজিটা আরও প্রকট হবে রাজস্ব (revenue) ও মুলধনী (capital) ক্ষেত্রে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখলে (সারণি-১)।

আগামী বছর উৎপাদন যদি এতটাই বাড়বে তবে রাজস্ব ও মূলধনী খাতে আয় ২০১৫-১৬-তে সে হারে বাড়বে না কেন? আরও উল্লেখযোগ্য হলো পরিকল্পনা খাতে ব্যয় সংকোচন। গত

সারণি - ১

এক ঝলকে বাজেট (কোটি টাকায়)

	২০১৩-১৪ *প্রকৃত*	২০১৪-১৫ *বাজেট*	২০১৪-১৫ *সংশোধিত*	২০১৫-১৬ *বাজেট*
রাজস্ব খাতে আয়	১০১৪৭২৪	১১৮৯৭৬৩	১১২৬২৯৪	১১৪১৫৭৫
মূলধনী খাতে আয়	৫৪৪৭২৩	৬০৫১২৯	৫৫৪৮৬৪	৬৩৫৯০২*
মোট আয়	১৫৫৯৪৪৭	১৭৯৪৮৯২	১৬৮১১৫৮	১৭৭৭৪৭৭
পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়	১১০৬১২০	১২১৯৮৯২	১২১৩২২৪	১৩১২২০০
পরিকল্পনাখাতে ব্যয় (প. ব্যয়)	৪৫৩৩২৭	৫৭৫০০০	৪৬৭৯৩৪	৪৬৫২৭৭
জাতীয় আয়ে প.ব্যয়ের অংশ	২৯%			২৬%
মোট ব্যয়	১৫৫৯৪৪৭	১৭৯৪৮৯২	১৬৮১১৫৮	১৭৭৭৪৭৭
ফিসকাল ঘাটতি	৫০২৮৫৮	৫৩১১৭৭	৫১২৬২৮	৫৫৫৬৪৯
মোট ব্যয়ে ঘাটতির অংশ	৪.৪%	৪.১%	৪.১%	৩.৯%

*এর মধ্যে ৬৩,৫০০ কোটি টাকা আসবে সরকারি সম্পত্তি বেচে।

দুবছরে তা মোট ব্যয়ের ২৯% থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ২৬%।

খ) দাবি : এই বাজেটে সামাজিক উন্নয়নে জোর দিয়েছে সরকার। বলা হয়েছে, রাজস্ব খাতে আয় বাড়লে মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার যোজনা, আইসিডিএস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বরাদ্দ আরও বাড়বে।

বাস্তব হচ্ছে, সরকারের পরিকল্পিত আয় বাড়ে নি (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)। ২০১৪-১৫ সালে পরিকল্পিত আয়ের পরিমাণ ছিল ১৭,৯৪,৮৯২ কোটি টাকা। অনুমান করা হচ্ছে, তা কমে দাঁড়াবে ১৬,৮১,১৫৪ কোটি টাকায়। এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঘাটতির কোপ পড়বে মূলত বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। ২০১৩-১৪ আর ২০১৪-১৫, এই এক বছরে সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ৭২,১৪৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। পরবর্তী বছরেও ঘাটতি হলে সামাজিক প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ আরো কমবে।

গ) দাবি: যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের আর্থিক অবস্থা মজবুত করতে রাজ্য 'করের' ('divisible pool of taxes') ৪২% পাবে। এতে রাজ্যের আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতা বাড়বে।

পরে হিসেব করে দেখা গেল কেন্দ্র ডান হাতে যা দিয়েছে বাম হাতে তা কেটে নিয়েছে। পুরোটাই লোক দেখানো গল্প। বাস্তবের সাথে তার আসমান জমিন ফারাক! উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে এই বাজেটে সর্ব শিক্ষা অভিযান খাতে সর্ব মোট ২১.৪ শতাংশ ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। তেমনি আইসিডিএস প্রকল্পে বাজেট ছাঁটায়ের পরিমাণ ৫০ শতাংশ এবং জাতীয় জীবিকা মিশনের আওতায় বাজেট ছাঁটাই ১২ শতাংশ। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪.০৫ লক্ষ কোটি টাকা। আর বর্তমান বাজেটে সেটি কমে দাঁড়িয়েছে ৩.২৪ লক্ষ কোটি টাকা।

ঘ) দাবি : MGNREGA নিয়ে উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই। সরকার গ্রামীণ কর্মসংস্থানের প্রতি দায়বদ্ধ। ৩৪,৬৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে ২০১৫-১৬ সালের জন্য।

উৎকণ্ঠার কারণ আছে বইকি! গত ক মাস ধরেই প্রধানমন্ত্রী নানা ভাবে MGNREGA-র সমালোচনা করছিলেন। বলছিলেন, সারা দেশব্যাপী ঐ বিশাল কর্মকাণ্ড না চালিয়ে বিশেষ বিশেষ জেলা ভিত্তিক এই কর্মসূচি চলবে। প্রশ্নটা এখানেই। কোন্ কোন্ জেলা বা অঞ্চল? বাণিজ্য মহল যেগুলোকে EPZ বা NIMZ (National Investment and Manufacturing Zones) বলে চিহ্নিত করেছে? যে সব রাজ্য সেজ বা NIMZ-এর বিরোধিতা করবে (যেমন পশ্চিমবঙ্গ) তাদের ছেঁটে ফেলা হবে? সরকারের টাকায় গ্রামীণ পরিকাঠামো ও সামাজিক সম্পদ

সারণি : ২

কর বাবদ মোট আয় (কোটি টাকায়)

	২০১৩-১৪ প্রকৃত	২০১৪-১৫ বাজেট	২০১৪-১৫ সংশোধিত	২০১৫-১৬ বাজেট
কর্পোরেট কর	৩৯৪৬৭৮	৪৫১০০৫	৪২৬০৭৯	৪৭০৬২৮
আয়কর	২৪২৮৫৭	২৮৪২৬৬	২৭৮৫৯৯	৩২৭৩৬৭
সম্পদ কর	১০০৮	৯৫০	৯৫০	০
আমদানি শুল্ক	১৭২০৮৫	২০১৮১৯	১৮৮৭১৩	২০৮৩৩৬
কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক	১৭০১৯৮	২০৭১১০	১৮৫৪৮০	২২৯৮০৮
পরিষেবা কর	১৫৪৭৭৮	২১৫৯৭৩	১৬৮১৩২	২০৯৭৭৪
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কর	৩১৩০	৩৪০১	৩৪৩৮	৩৫৭৭
মোট কর	১১৩৮৭৩৪	১৩৬৪৫২৪	১২৫১৩৯১	১৪৪৯৪৯০

সারণি : ৩

সামাজিক পরিষেবায় ব্যয়

	২০১৩-১৪ প্রকৃত	২০১৪-১৫ বাজেট	২০১৪-১৫ সংশোধিত	২০১৫-১৬ বাজেট
রাজস্ব খাতে	১৩১৪৭১	৬৪১৯২	৫৭৮১৮	৭১৫০৭
মূলধনী খাতে	৩৩৮৭	৬৭৩০	৪৮৯২	৬০৪৩
মোট	১৩৪৮৫৮	৭০৯২২	৬২৭১০	৭৭৫৫০

(Social Capital) MGNREGA-র মাধ্যমে সৃষ্টির পর বাণিজ্যিক সংস্থাকে সেসব জমি অধিগ্রহণ করে হস্তান্তর করতেই কি ৩৪,৬৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হলো? তাই কি জমি বিল নিয়ে এত তোড়জোড়? আশঙ্কাটা সেখানেই।

MGNREGA-র ফলে কৃষিক্ষেত্রে যত শ্রমিকের আকাল হবে ও মজুরি বৃদ্ধি পাবে, তত বেশি সংখ্যায় কৃষক চাষ থেকে সরে আসবেন। কৃষিতে মুনাফা কমার ফলে তাঁরা সহজেই চাষের জমি শিল্পপতিদের কাছে বিক্রি করতে সম্মত হবেন।

ঙ) কর্পোরেট করের হার ৩০% থেকে কমিয়ে ২৫% করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর দাবি, এতে বিনিয়োগ বাড়বে। ভারতে কর্পোরেট করের হার খুব বেশি। তাই তা কমানো উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অনেক উন্নত দেশের কর্পোরেট করের হার ৩০ শতাংশের বেশি। সেসব দেশে তো বিনিয়োগ কম হয় না। আর করের হার কমালেই কর্পোরেট কর্তারা লভ্যাংশের বাকিটা এদেশেই বিনিয়োগ করবে তার কী নিশ্চয়তা আছে? বাস্তবে দেখা গেছে, এদেশে কর্পোরেট সংস্থাগুলি মাত্র ২৩.২২% হারে কর প্রদান করে থাকেন। আর ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা উৎপাদনকারী বড় সংস্থাগুলি কর দেয় মাত্র ২০.৬৮%। তাছাড়া ২০১৪-১৫ সালে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে ৬২,৩৯৮.৬ কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হয়েছিল (শুভনীল চৌধুরী, *এই সময়*, ১ মার্চ, ২০১৫)

করের বোঝা বাড়বে আম জনতার ওপর। দেশের পরিষেবা ক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে। এই সুযোগে সরকার পরিষেবা করের হার ১২% থেকে বাড়িয়ে ১৪% করেছে। কর আদায়ও বাড়বে আনুমানিক ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। এক বৃহৎ স্ব-রোজগেরে বিত্তবান শ্রেণী, যেমন ব্যবসায়ী, ডাক্তার ইত্যাদি আছেন, যাঁদের অনেকেই কর দেন না (দেশের আনুমানিক ২০% নাগরিকদের বিত্তবান বলা চলে, কিন্তু দেশের মাত্র ৫% নাগরিক আয়কর দেন), তাঁদের আয়করের আওতাভুক্ত করার কোনো তাগিদ এই সরকারের পেশ করা বাজেটে অনুপস্থিত।

প্রশ্ন হচ্ছে, কর্পোরেট কর কমালে যদি সংস্থার মুনাফার হার বাড়ে তবে আমজনতার ক্ষতি কোথায়? 'চুঁইয়ে আসা' সুফল তো গরিব মানুষও পাবেন। না, গরিব মানুষ সুফল পান না। অর্থনীতির এই তত্ত্বটা বহু দেশে মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। কর্পোরেট কর হ্রাস পেলে বরং সংস্থার শ্রমিক কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। অধিক মুনাফার লোভে শ্রমিক কর্মচারীর প্রাপ্য নানা সুবিধে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যেমন, ক্যান্টিনে দেওয়া ভর্তুকি বা পুজোর বোনাস। উন্নত মানের টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে (সিসিটিভি, বায়োমেট্রিক কার্ড) কর্মক্ষেত্রে কড়া নজরদারি চালু হতে পারে। এতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়বে কিন্তু মজুরি বাড়বে না। সংস্থার মুনাফা বাড়বে। সেই মুনাফা যদি ভিন্ দেশে বিনিয়োগ হয় বা বিলাস দ্রব্য আমদানিতে ব্যবহৃত হয় (ধরুন মুকেশ আম্বানি তার ছেলেকে জন্মদিনে একটি অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ কিনে দিলেন) তাহলে কী লাভ হবে কর কমিয়ে? শ্রমজীবী মানুষ আরও শোষিত হবেন। (বিস্তারিত জানতে দেখুন, Dan Riker, 'What Trickle -Down Economics Has Done to the US : The Rich Get All The Money', *Truthout*, March 5, 2015) গত ক' মাসে শ্রম আইনে আনা নানা সংশোধনী আমাদের এই আশঙ্কাকে জোরালো করে না কি?

চ) দাবি : নভেম্বর ২০১২ খুচরো পণ্যে মুদ্রাস্ফীতির (CPI) হার ছিল ১১.২%, যা বর্তমানে নেমে দাঁড়িয়েছে ৫.১%, এবং সব চেয়ে বড় কথা, পাইকারি মূল্যের (WPI) বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক।

ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক মানে বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি। চাষি, তাঁতি, শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম কম পাচ্ছেন। তাহলে CPI ৫.১% বাড়ল কেন? এর সাথে চাহিদার সম্পর্ক নেই। খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধি খুব সম্ভবত পরিবহন ব্যয় বাড়ার দরুন। যেহেতু ভারতের পাইকারি দ্রব্য মূলত রেলে পরিবাহিত হয় এবং গত ২৫ জুন ২০১৪ রেলমন্ত্রী পরিবহন মাশুল ৬.৫% বাড়িয়েছিলেন (বর্তমান রেল বাজেটে তা আরও বেড়েছে), খুচরো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ সেটাই। অর্থনীতির ভাষায়, 'কস্ট পুশ ইনফ্লেশন'।

আমাদের মনে হয় যে এটাই ভারতীয় অর্থব্যবস্থার মূল সংকট। বাজারে চাহিদা কমে যাচ্ছে। যোগান বাড়ছে। চাহিদা কমছে কেন? মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে বলে। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা যে হারে বাড়ছে (বেশি সময় ঘাম ঝরিয়ে ও বিশ্রামের সময় হ্রাস করিয়ে, CCTV, Biometric হাজিরা ব্যবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে, এবং উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে), সে হারে মজুরি/বেতন বাড়ছে না। তাই বাজারে যোগান বাড়ছে কিন্তু চাহিদা বাড়ছে না। চাকরির স্থায়ীত্বে অনিশ্চয়তা থাকার ফলে এক বিশাল সংখ্যক নাগরিক সচেতনভাবে স্রেফ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের মধ্যে তাঁদের চাহিদা সীমিত রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। এই সংকট কাটাতে MGNREGA খানিকটা সাহায্য করছে— গ্রামীণ ক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধি ক'রে। কিন্তু এটা সাময়িক প্রকল্প। মূল উদ্দেশ্য সাধিত হলে সরকার এই প্রকল্প গুটিয়ে ফেলবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, ইউপিএ ও এনডিএ, দুই সরকারই অভ্যন্তরীণ বাজারের পরিধি বৃদ্ধির পথে না হেঁটে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি বাড়ানোর উদ্যোগ না নিয়ে, মজুরি হ্রাস করে আন্তর্জাতিক পুঁজিকে আকৃষ্ট করতে চাইছে 'Make in India' শ্লোগান তুলে। বিশ্ববাজারের চাহিদা মিটলে শিল্পপতিদের মুনাফা আরও বাড়বে, মধ্যবিত্তের এক অংশ উচ্চবিত্ত হবে, কিন্তু ভারতের কোটি কোটি সাধারণ নাগরিকের

নুন আনতে পান্তা ফুরাবে। 'আচ্ছে দিন' তাদের কাছে মরীচিকা হয়েই থাকবে।

ছ) দাবি : বাজেট ঘাটতি (Fiscal Deficit) কমানো গেছে। আগামীতে আরও কমবে। (সারণি-১ দ্রষ্টব্য) বর্তমানে তা জাতীয় উৎপাদনের ৪.১ % মাত্র।

এতে কী প্রমাণ হলো? আর্থিক শৃঙ্খলা দৃঢ় হলো। কীসের বিনিময়ে? ব্যয় হ্রাস ক'রে। ২০১৪-১৫ বর্ষে আয়ব্যয়ের পরিমাণ ধার্য ছিল ১৭,৯৪,৮৯২ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ বর্ষে সে সংখ্যাটি কমে দাঁড়াল ১৭,৭৭,৪৭৭ কোটি টাকা। প্রশ্ন উঠতেই পারে, জাতীয় উৎপাদন ৭.৪% বৃদ্ধি হলে সরকারের আয়-ব্যয় হ্রাস পায় কেন? আর লক্ষণীয়, ২০১৫-১৬ বর্ষে পুঁজি প্রাপ্তির হার (Capital Receipt)-এর একটা বড় অংশ, ৬৩,৫০০ কোটি টাকা, জোগাড় হবে সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে।

গ্যারি হামেল ও সিকে প্রহ্লাদ ১৯৯৪ সালে *Competing for the Future* নামে একটি বই লিখে শিল্প মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা গবেষণা করে দেখিয়েছিলেন যে সেই সব শিল্প সংস্থাই ভবিষ্যতে টিকে থাকবে যারা চটজলদি লাভের পথে না হেঁটে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে আয় বাড়ানোর পথে হাঁটে। একটি সংস্থা দুভাবে তাদের লাভ বাড়াতে পারে। এক, খরচের তুলনায় আয় বাড়িয়ে। খরচ যে হারে বাড়বে আয় তার চেয়েও দ্রুত হারে বাড়াতে হবে। সংস্থার কর্ণধারদের লক্ষ্য হবে আয়ের পরিধি বাড়ানো। তাঁর এর নাম দিয়েছিলেন Numerator Management। যদিও এটা কঠিন পথ, কিন্তু ভবিষ্যতের সংস্থাগুলির কর্ণধাররা এই কঠিন পথই বেছে নেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা জয়ী হন। দ্বিতীয় একটি পথেও লাভ বাড়ানো যায়। আয়ের তুলনায় ব্যয় কমিয়ে। এই সব সংস্থার কর্ণধারদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যয় সংকোচন। সেটাই সহজ পথ। চটজলদি লাভের মুখ দেখা যায় এই পথে। এর নাম Denominator Management। লাভ বাড়লে আমানতকারীদের বাহবা ও পুরস্কারও মেলে। কিন্তু দেখা গেছে, এই সব সংস্থাগুলো বাজারের প্রতিযোগিতায় বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

মেদ ঝরানো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। সেটা মেদবহুল মানুষ ও শিল্প সংস্থা— দুয়ের জন্যই একথা প্রযোজ্য। আজকাল নানাবিধ শল্য চিকিৎসার মাধ্যমেও মেদ কমানো যায়, ছুরি কাঁচির প্রয়োগে। সমস্যা হচ্ছে, তাতে মেদ সাময়িক ভাবে কমে ঠিকই, দেখতেও বেশ ছিমছাম লাগে। কিন্তু দীর্ঘকালীন স্বাস্থ্যের কোনও উপকার হয় না, বরং অপারেশনের ফলে স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। একটি প্রাণবন্ত শিল্প সংস্থাও এ ধরনের অপারেশনের ফলে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে অকালে মারা পড়তে পারে।

আমাদের জেটলি সাহেবও (তাঁর পূর্বসূরীরাও কম যান না) অতি উৎসাহী শল্য চিকিৎসকের মতো রোগীর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের কথা না ভেবেই মেদ কেটে চলেছেন। ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় এমনিতেই রুগ্ন দশা। মাঝে মাঝেই বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদি উৎসাহী দাতারা রক্তদান করে তাকে চাঙ্গা করে রাখার চেষ্টা করেন। যে দেশের এক বিশাল সংখ্যক নাগরিক আধবেলা খেয়ে দিন কাটায় সে দেশের মেদ ঝরানোর চেষ্টা পরিকল্পিত খুনের সমতুল্য অপরাধ। এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

গ্রীস সংকট

১০ পৃষ্ঠার পর

ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক, আইএমএফ— মুখোমুখী হতে হবে খুব শীঘ্রই। তৃতীয়ত, নিও-লিবারাল বিশ্বায়নের গত তিরিশ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, দুরকম নীতির ফলে সাফল্য এসেছে। ধনী বা কেন্দ্রের দেশগুলির জন্য একরকম নীতি, আবার পরিধির গরিব দেশগুলির জন্য আর একরকম নীতি। ধনী দেশগুলি মূলত পুঁজি নিবিড় শিল্পায়নের পথে হেঁটেছে— এর একটি উদাহরণ হল জার্মানি। আর অন্যদিকে শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলিকে রপ্তানি করে দেওয়া হয়েছে পূর্ব এশিয়াতে। এর ফলে চীন এবং অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি সফল হয়েছে। মাঝখান থেকে বাদ পড়েছে গ্রীসের মতন কিছু দেশ। এরা (আমরা এর আগে দেখিয়েছি কিভাবে) ফাটকাপুঁজির দৌলতে কিছুটা ভেসে চলেছিল, কিন্তু ২০০৮ সালে মার্কিন সংকটের পরে ফাটকা পুঁজির জোগান ও প্রভাব কমে যায়। এবং গ্রীস এক প্রবল সংকটে নিমজ্জিত হয়।

শেষে একথা উল্লেখ্য যে, ২০০৮-এর মার্কিন সংকট এবং বিশেষত ২০১১-র আরব বসন্তের পর থেকে আমাদের আশেপাশে ঘনীভূত হওয়া বামপন্থার সংকটের বাইরে একটু যদি তাকাই তাহলে কিন্তু এক নতুন প্রভাতের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে। শেষে বরং এক গ্রীক কবির এই আপাত চিরন্তন ভালোবাসার কবিতাটি দিয়ে শেষ করা যাক— পৃথিবী জুড়েই অন্ধকার আস্তে আস্তে কাটছে, তবে কুয়াশা রয়েছে প্রবল, ইশারাগুলো থাক আর ইঙ্গিতগুলোও থেকে যাক ভালোবাসায় ঘনীভূত হওয়ার অপেক্ষায়।

'Do you make money' they ask me 'from poetry?'
'Money?' I answer them, 'Money?
Does the lover ever make money?
Only the pimp makes money.'

Yfantis 2014

'তুমি কি কবিতা থেকে টাকা কামাও?', ওরা আমাকে শুধালো,
'টাকা রোজগার?', আমি তাদের শুধোই।
'প্রেমিকরা কি ভালোবাসা থেকে টাকা কামায়?
কেবল বেশ্যার দালালরাই তো টাকা কামায়'।

—ইফানতিস, ২০১৪

প্রবন্ধ

কয়লার বাজারিকরণ এবং কয়লা মজদুরদের চ্যালেঞ্জ

প্রশান্ত হালদার

অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্ব ন মুঞ্চতে। কয়লা শতবার ধুলেও কালো যায়না। কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। গত ২৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, ১৯৯৩ সাল থেকে বণ্টিত ২১৪টি কয়লা-ব্লকের বণ্টন রদ করে দিয়ে, দুর্নীতির ঝুল-কালি কিছুটা সাফ করার চেষ্টা করেছিল। মোদী সরকার এক ধাপ এগিয়ে অধ্যাদেশ জারি করে, কয়লা ব্লকগুলি বাণিজ্যিকরণের জন্য বরাদ্দ করে দেয়— 'Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance 2014' নামে যা পরিচিত।

অধ্যাদেশ অনুসারে, সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক দু'বার স্থগিত সমস্ত কয়লা-ব্লকগুলি— সরকারি, বেসরকারি, ভারতে নিবন্ধিত বিদেশি কোম্পানী প্রভৃতি সকল ব্যবসায়ীদের— নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ করতে হবে। নিজ ব্যবহারের জন্য, বিক্রয়ের জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে তাদের খননের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। ১৯৭৩ সালের কয়লাখনি রাষ্ট্রিয়করণ আইনে ব্যক্তিগত মালিকদের এইসব সুযোগসুবিধা ছিলনা। এতদিন সরকারই এইসব অধিকার ভোগ করতো। বিদ্যুৎ, সিমেন্ট, ইস্পাত— যেখানে কয়লার ব্যবহার সবথেকে বেশি, সেইসব শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত মালিকদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ সালে খননের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখন তারা একে অপরকে কয়লা বেচতে পারে। এটাই এই অধ্যাদেশের নয়া সংযোজন। নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সর্বাধিক পাঁচ কোটি টাকা ফী জমা দিতে হবে। সর্বোচ্চ দর যে দেবে, তাকেই কয়লা-ব্লক বরাদ্দ করা হবে। নিলামের ন্যূনতম দর, টন পিছু ১৫০ টাঃ ধার্য করা হয়েছে।

অধ্যাদেশ অনুসারে বণ্টনপোযোগী কয়লা-ব্লকগুলিকে তিনটি তপশিলে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম তপশিলে, ২০৪টি কয়লা-ব্লক সরকারি, বেসরকারি, দেশি, বিদেশি— সব কোম্পানি নিলাম ডাকতে পারে। বিদ্যুৎ, সিমেন্ট বা ইস্পাত শিল্পের সাথে সংযুক্ত থাকার প্রয়োজন নেই। এটাও এই অধ্যাদেশের নতুন সংযোজন। দ্বিতীয় তপশিলে আছে ৪২টি কয়লা-ব্লক, যেখানে উৎপাদন চালু আছে। আর তৃতীয় তপশিলে আছে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত ৩২টি কয়লা-ব্লক। বিদ্যুৎ, সিমেন্ট বা ইস্পাত শিল্পের সাথে যারা সংযুক্ত, শেষোক্ত ক্ষেত্রে তারাই কেবল নিলাম ডাকতে পারবে। যে কয়লা-ব্লকগুলিতে উৎপাদন চালু আছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ের আদেশানুসারে, সেগুলিতে পুনরায় নিলাম ডাকা হবে এবং সেক্ষেত্রে টন প্রতি অতিরিক্ত ২৯৫ টাকা যোগ করতে হবে। এইপ্রকার ২৭৮টি কয়লা-ব্লকের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। অথচ রদ হয়ে যাওয়া কয়লা-ব্লকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২১৪। প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলি কয়লা-ব্লকের বণ্টন কি সত্যই জরুরী ছিল? ইতিপূর্বে, যতগুলি কয়লা-ব্লক বণ্টন করা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ৪২ বা ৪৫টি-তে উৎপাদন শুরু হয়েছিল। বাকিগুলি ভবিষ্যৎ বাজারের জন্য অপেক্ষা করছিল। আজও সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছেনা। অধ্যাদেশ সরকারকে কয়লা-ব্লকের তালিকা-বৃদ্ধির ক্ষমতা দিয়েছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কয়লা-ব্লক বণ্টনের তালিকা কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, সেটাই এখন দেখার। ভারতে ৩০১৫৬ কোটি টন কয়লার ভাণ্ডার মজুত আছে। এই ভাণ্ডার কী পরিমাণ ফোঁপরা করে দেওয়া হবে? এই অধ্যাদেশ দ্বারা, 'Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973' এবং 'Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957' আরও একবার সংশোধন করে উদারীকরণের বিধান লাগু করা হলো। হতে পারে, আগামী দিনে সম্ভবত আইন-কানুনেরই বালাই রাখা হবেনা।

অধ্যাদেশ নিয়ে বিভিন্ন স্তরে প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার। কারোর মতে, এটা কয়লা-শিল্পকে বেসরকারিকরণের চক্রান্ত, তো কেউ কেউ এটাকে কয়লার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের অধ্যাদেশ আখ্যা দিয়েছেন। কয়লা মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জবাবে বলেছেন, কয়লা শিল্পে ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগই উদ্দেশ্য, না হচ্ছে কোল ইন্ডিয়ার বিরাষ্ট্রিয়করণ, না আছে সরকারের এমন কোনো পরিকল্পনা। কয়লা শিল্পে কর্মদক্ষতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের রাস্তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া দেশে কয়লার জোগান নিয়মিত করার জন্য এটা প্রয়োজন। শক্তি-উৎপাদন ক্ষেত্রের জন্য এটা অত্যন্ত আবশ্যিক। পূর্বতন সরকারের মতোই, মোদী সরকার, প্রকৃতপক্ষে আর্থিক সংস্কারকেই উন্নয়নের একমাত্র রাস্তা মনে করে। বরং, আগের সরকারের থেকে আরও চরমে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই সরকার ঝুঁকে আছে। যেমন, কয়লা-ব্লক নিলাম করে, কয়লা বাণিজ্যিকরণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ১৯৯০ সালে দেশে 'নয়া আর্থিক নীতি' নামে যা চালু হয়েছিল, কয়লা ক্ষেত্রে সেটাই লাগু করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, সরকারের কয়লা ভাণ্ডার নিলাম করার অধিকারই নেই। ১৯৭৩ সালের 'কয়লাখনি রাষ্ট্রিয়করণ আইন' হোক বা ১৯৫৭ সালের 'খনি ও

খনিজ (বিকাশ এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন', কোথাও ভূ-নিম্নস্থ সম্পদ রাষ্ট্রিয় সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়নি। ভারতের সংবিধানেও এরূপ কোনো উল্লেখ নেই। কয়েকবছর আগের কথা। কেরলে এক জমি মালিক, নিজ জমিতে গ্রানাইট পাথর খনন করার জন্য, কেরল সরকার জমির মালিকের থেকে রয়ালটি দাবি করে নোটিশ জারি করে। রয়ালটি না দেওয়ার জন্য খনন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। এর পর, জমি-মালিক কেরল সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, যেটা শেষপর্যন্ত উচ্চতম ন্যায়ালয় পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে, জমির মালিকের থেকে রয়ালটি নেওয়ার আইনগত অধিকার কেরল সরকারের নেই। ভূ-নিম্নস্থ সম্পদের উপর সরকারের স্পষ্টত কোনো অধিকার নেই।

কয়লা-মন্ত্রী যাই বলুক না কেন, বাস্তবকে অস্বীকার করা যাবেনা যে, আলোচ্য অধ্যাদেশে নিলামের মাধ্যমে, দেশি-বিদেশি প্রাইভেট কোম্পানিগুলিকে কয়লা ভাণ্ডার কব্জা করার ব্যবস্থা নেওয়া হলো। আর খনন ও বিক্রি করার অনুমতি দিয়ে কয়লার মতো প্রাকৃতিক সম্পদকে বাজারী সম্পদে পরিণত করা হলো। কয়লা-মন্ত্রী এটাকে কয়লা-শিল্পের বেসরকারিকরণ হিসাবে মানুন আর না মানুন, কয়লার বাজারিকরণ অবশ্যই বলতে হবে। সর্ব্বোচ্চ দর হেঁকে কয়লা ভাণ্ডার কব্জা করে, প্রাইভেট কোম্পানী নিজ মর্জি মাফিক কয়লা তুলবে আর মর্জি মাফিক বেচবে। সরকারের কোনো ভূমিকা থাকবে না। যেখানে, উৎপাদন আর বিক্রি, দুটোই ব্যক্তি-মালিকদের ইচ্ছানুযায়ী বাজারের উপর নির্ভর করে, তাকে বাজারিকরণ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? আজ যখন বড়ো বড়ো মাইনিং কোম্পানি প্রাকৃতিক সম্পদ কব্জা করার জন্য লালায়িত, ভারতে অধ্যাদেশ জারি করে, এক ঝটকায় কয়লার মতো প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের হাতে সঁপে দেওয়া হলো। দেশি-বিদেশি মাইনিং কোম্পানিগুলো দীর্ঘদিন যার জন্য অপেক্ষায় ছিল, এখন তারা দাঁও মারার জন্য নেমে পড়বে। মজুত কয়লা এবং তার বাজার দখল করে কয়লা ক্ষেত্রের সমীকরণটাই বদলে দেবে। যেদিক থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন, কর্পোরেট সেক্টরকে এই বিশাল পরিমাণ ছাড়, সরকার এবং তাদের মধুর সম্পর্কের অন্যতম প্রমাণ।

কয়লা-শিল্পের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য, ১৯৭১ ও ১৯৭৩ সালে কয়লাখনি জাতীয়করণ করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে নয়া আর্থিক নীতি রূপায়নের অনুক্রমে সরকার হাত গুটিয়ে নিল। কয়লা শিল্পের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব বেসরকারি মালিক ও ঠিকাদারদের উপর ন্যস্ত হয়। দেশে মোট কয়লা উৎপাদনের প্রায় ৯০ শতাংশ কোল ইন্ডিয়া এবং সিংগ্রেলী কলাখনিতে উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি উৎপাদন ঠিকার মাধ্যমে হয়। গত কয়েক বছর ধরে বার্ষিক ২ শতাংশ হারে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ৫৬.৬০ কোটি টন পর্যন্ত পৌঁছেছে। যেক্ষেত্রে প্রয়োজন ৭৩.৯০ কোটি টন। সুতরাং, মাত্র ১৭.৩০ কোটি টন ঘাটতি মেটানোর জন্য কেন পুরো ব্লকটা নিলাম করতে হবে, এ প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেবেই। বলা হচ্ছে, এই ঘাটতি পূরণের জন্য কয়লা আমদানি করতে হচ্ছে। এই সামান্য কয়লা আমদানি বন্ধ করার জন্য পুরো মজুত কয়লা নিলাম করতে হবে কেন? কেন সরকার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির তালাশ করবে না? এর জন্যই কি কয়লাখনি জাতীয়করণ করা হয়েছিল? কয়লাশিল্পের উন্নয়নের জন্য যদি কয়লা ভাণ্ডার নিলাম উন্নয়নের পথ হয়, তাহলে দেশের উন্নয়নের জন্য দেশটাকেও নিলাম করা মেনে নিতে হয়, সব ক্ষেত্রেই এখন যেটা চলছে। মনমোহন সিং থেকে নরেন্দ্র মোদী—এটাই কয়লা ক্ষেত্রের গতিপথ।

এ কথা অনস্বীকার্য যে সরকারি প্রতিষ্ঠান কোল ইন্ডিয়া বাজারিকরণের প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে বাধ্য। ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলি শ্রমিকদের দিয়ে কম মজুরিতে বেশি উৎপাদনের ব্যবস্থাকে দৈনিক ব্যবহার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না। এছাড়াও নানা ধরণের সরকারি সহায়তায় এদের উৎপাদন ব্যয় কোল ইন্ডিয়ার তুলনায় কম হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলিকে দেওয়া আউট-সোর্সিং চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদনের খরচ কোল ইন্ডিয়ার তুলনায় অর্ধেকেরও কম। এটা পরীক্ষিত সত্য। স্বভাবতই মুনাফা করেও ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির কয়লার দাম কোল ইন্ডিয়ার কয়লার তুলনায় সস্তা। কে কিনবে কোল ইন্ডিয়ার কয়লা? দ্বিতীয়ত, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট জাতীয় যে ক্ষেত্রগুলিতে সবথেকে বেশি কয়লা ব্যবহার হয়, সেখানে এরা প্রধান সরবরাহকারী হয়েই গেছে, এখন কয়লার বাজারটাই দখল করতে বাকি। মন্দার শিকার হয়ে কোল ইন্ডিয়ার মৃত্যুবরণ দেখা যাবে। এরপর বেসরকারি কোম্পানিগুলির শর্তেই খোঁজা হবে সংকটমুক্তির পথ। এই হলো নয়া অধ্যাদেশের স্বরূপ।

কয়লা শ্রমিকদের চ্যালেঞ্জ

কয়লা শিল্পে এই পরিবর্তন যদিও সমাজের বিভিন্ন অংশে প্রভাব ফেলবে, কিন্তু যারা এই শিল্পের সাথে সরাসরি সংযুক্ত এবং যারা এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ শিকার, সেই কয়লা মজদুরদের উপরই তার রাশ টেনে ধরার প্রাথমিক দায়িত্ব বর্তায়। তৎসত্ত্বেও কয়লা মজদুর এবং তাদের ইউনিয়ন আরো একবার সংগ্রামের পথ থেকে পিছু হটলো। পাঁচ দিনের ঘোষিত হরতাল বড়ো লজ্জাজনক পদ্ধতিতে দেড় দিনের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

'কয়লা খনি (বিশেষ আইন) অধ্যাদেশ ২০১৪' জারির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পাঁচটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন— ইনটাক, এইচএমএস, সিটু, আইটাক এবং বিএমএস ৬ জানুয়ারি থেকে কয়লা শিল্পে পাঁচদিন হরতাল

আহ্বান করেছিল। প্রথম দিন অর্থাৎ ৬ জানুয়ারির ধর্মঘটের সাফল্য সরকারও স্বীকার করেছে। অথচ, দ্বিতীয় দিন, কয়লা মন্ত্রী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির আলোচনার পর শুধুমাত্র এই আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলো যে, ইউনিয়নগুলির দাবিদাওয়া বিবেচনা করার জন্য যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হবে এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো যে শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষা করা হবে। আলোচনার অনতিবিলম্বে মন্ত্রী বিবৃতি জারি করে দিল যে সরকার আর্থিক সংস্কারের পথ থেকে একটুও সরছে না। এভাবে মিথ্যা আশ্বাসে পাঁচ দিনের ধর্মঘট দেড় দিনে সমাপ্তির ঘোষণা করে দেওয়া হলো আর এটাকেই ইউনিয়নগুলি নিজেদের জয় হিসাবে উল্লেখ করে। এভাবে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কয়লা ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের ইতি টানা হলো।

উল্লেখ্য যে গত ২৪ নভেম্বরেও কয়লা শিল্পে হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল। সেদিনও সরকারের মিথ্যা আশ্বাসে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছিল। সরকার আশ্বাস দিয়েছিল যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে আলাপ-আলোচনা করে নয়া আইন প্রণয়ন করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। একতরফা অধ্যাদেশ জারি করে, সরকার ইউনিয়নগুলির মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে।

অদ্ভুত বিষয় হলো, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এইভাবে নতজানু হওয়ার পরেও শ্রমিকরা চুপ করে থেকেছে। কিছু শ্রমিকের, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের চাপা গালমন্দ করা ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। হতে পারে, কোথাও কোথাও শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, যা প্রচারিত হয়নি।

উল্লেখ্য যে গত ২৪ নভেম্বর কয়লাখনিগুলিতে হরতাল ডাকা হয়েছিল। সে সময়েও সরকারের মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে হরতাল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সরকার বলেছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই অর্ডিন্যান্স জারি করা হবে। সরকার এক তরফাভাবে অর্ডিন্যান্স জারি করে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সপাটে এক চড় কষিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ইউনিয়নগুলির এইরকম নতজানু হবার পরও শ্রমিক সম্প্রদায় নীরব—এ এক আশ্চর্যের বিষয়। সামান্য কিছু শ্রমিক চাপা গলায় ইউনিয়নের সমালোচনা ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখান নি। এমন হতে পারে কোথাও কোথাও শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল, কিন্তু তাকে প্রকাশ্যে আসতে দেওয়া হয়নি। তবে এটাও জানা যায়নি শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য তীব্র আকুতি ছিল কিনা, বা হরতাল পালনের ইচ্ছা ছিল কিনা। ট্রেড ইউনিয়নগুলির কোনো কোনো নেতার বক্তব্য এই যে মাত্র কুড়ি শতাংশ শ্রমিক বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে হরতালে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবার ভিতরে ভিতরে পাঁচদিনের বেতন নষ্ট হবার জন্য আফশোষও ছিল। ফলে হরতাল প্রত্যাহারের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই কাজে যোগদান করেছেন। ই.সি.এল খনি অঞ্চলে এটাও দেখা গেছে যে, হরতালের আগে প্রতিবাদের বিষয়গুলি নিয়ে কোনো প্রচারও চালানো হয়নি। এসব সত্ত্বেও দেড়দিন হরতাল একশো শতাংশ সফল ছিল। এই ঘটনা উপরোক্ত মতামতকেই প্রতিষ্ঠিত করে। কয়লাখনিতে বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব চেহারা হল ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিজেদের শাখা প্রতিষ্ঠার জন্যই হরতালের ডাক দেয়।

স্মরণীয় এই যে, কয়লাখনি রাষ্ট্রীয়করণের আগে শ্রমিকগণ এবং তাদের ইউনিয়ন বৃহৎ আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। বিশেষত, রানীগঞ্জ আর ঝরিয়া অঞ্চলের খনিগুলিতে। খাদানমালিক ও তাদের গুণ্ডাবাহিনির অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের গৌরবময় প্রতিরোধের ইতিহাস আজও শ্রমিক আন্দোলনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কয়লাখনি রাষ্ট্রীয়করণের নেপথ্যে তৎকালীন সরকারের কয়লাখনিগুলিতে চাহিদা অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত কয়লা উত্তোলন বন্ধ করা, খনি সুরক্ষাবিধি চালু করা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয়করণের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল তো বটেই, তবে লাগাতার শ্রমিক আন্দোলনও এর প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। এই জন্যই কয়লাখনি রাষ্ট্রীয়করণের কারণগুলির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সমস্যাবলী বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে তবে আজ যখন কয়লাখনিগুলিকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে তখন শ্রমিকসমাজ এবং তাদের ইউনিয়নগুলি নীরব রয়েছে কেন? উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ সময়ে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল বামপন্থী ইউনিয়নগুলি এবং অধিকাংশ লড়াকু শ্রমির এই ইউনিয়নের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। ঐ ইউনিয়নগুলির কিছু সচেতন মতবাদ ছিল, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য একটি রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল যা প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ় করে চলবার দিশা দেখাতে সক্ষম ছিল। এর প্রভাব শ্রমিকদের ওপরও পড়ত। আজ যখন সরকার রাষ্ট্রীয়করণকে 'ভুল' প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তখন কেন শ্রমিকসমাজ প্রতিবাদকে বিসর্জন দিচ্ছে আর বামপন্থী ইউনিয়নগুলি আন্দোলনের পথ ত্যাগ করছে? গুরুত্বপূর্ণ এই পরিবর্তন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

কয়লাখনিতে শ্রমিকসমাজ এবং ইউনিয়নগুলির এই শোচনীয় দশা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। এর অনেকগুলি দিক আছে। কয়লাখনি রাষ্ট্রীয়করণের পর খনির পরিবেশ ও অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। আগের মতো শোষণ নেই, অত্যাচার নেই। প্রতি চার বছর অন্তর শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন 'সমঝোতা' চুক্তি শুরু হল। শ্রমিক আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় দাঁড়ালো নির্দিষ্ট সময় অন্তর সমঝোতার ব্যবস্থা করা, এবং বেশি বেশি সুবিধা আদায় করা এবং ঐগুলিকে বাস্তবায়িত করা। এই বিষয়ে যে ইউনিয়ন যত

দক্ষ, তার সদস্য সংখ্যা তত বেশি। বামপন্থা আর দক্ষিণপন্থার পার্থক্য ক্রমশ অস্পষ্ট হতে লাগল। ভূমিগত খনির অবহেলা বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন নেই বিবেচনীহীন যন্ত্রব্যবহারের বিরুদ্ধে, ঠিকাদার প্রথা প্রচলন বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, নতুন কর্মসংস্থান বিষয়ে কোনো দাবি নেই। শ্রমিককুলের ধারণা এই দাঁড়ানো যে ইউনিয়নগুলির মুখ্য কাজ হল তাদের বেতনবৃদ্ধি আর অন্যান্য সুবিধা আদায় করা মাত্র। একদিকে শ্রমিক সমাজ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল আর শ্রমিক নেতারা বিদেশি প্রযুক্তি নির্ভর কর্মসংস্থানহীন বিকাশের প্রবক্তা হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছিল। পরিবর্তে মৃত শ্রমিকদের উত্তরাধিকারীদের চাকরি দেওয়া, উচ্ছেদ হওয়া মানুষকে চাকরি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। উৎপাদনক্ষেত্রে ঠিকাদারি প্রথা মেনে নেওয়া হল, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল। খনিশ্রমিকবৃন্দ এবং তাঁদের ইউনিয়ন রইলেন নীরব দর্শক। বামপন্থী ইউনিয়নগুলি যে কেবলমাত্র সংঘর্ষের পথ পরিহার করল তা নয়, রাজনৈতিক সচেতনতার থেকেও দূরে সরে গেল অনেকটাই। এদের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকসমাজেরও একই অবস্থা হল।

১৯৯০ থেকে এদেশে নতুন অর্থনীতি প্রয়োগের পর কয়লাখনি ক্ষেত্রও এর আওতার বাইরে থাকতে পারেনি। ১৯৯৩ সালে কয়লাখনি অধিগ্রহণ বিধি ১৯৭৩ সংশোধন করে ইস্পাত ব্যতীত ব্যক্তিমালিকাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকেও ক্যাপটিভ খনি সৃজনের অনুমোদন দেওয়া হল। এর সঙ্গে রেলওয়াগনের সাহায্য কয়লা সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হল, যা আগে নিষিদ্ধ ছিল। এরপর ১৯৯৬ সালে সিমেন্ট কোম্পানিগুলিকেও এই তালিকাভুক্ত করা হল। এখানেই শেষ নয়, ইস্পাত ও বিদ্যুৎ শিল্পের জন্য খননকার্য ১০০ শতাশ এবং সিমেন্ট শিল্পের জন্য ৭৪ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতিও দেওয়া হল। আজ যখন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে, তখন বিনিয়ন্ত্রণের জন্য চিৎকার করা হচ্ছে, অথচ যখন অনেক আগেই এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, ইউনিয়নগুলি এই প্রক্রিয়াকে বিনিয়ন্ত্রণ বলে স্বীকার করেনি বা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেনি। পরে এই দুর্নীতি বিষয়ে চর্চা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ আদালতে মামলাও হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি কখনোই শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি। কারণ ১৯৭৬ সালেই কয়লাখনি অধিগ্রহণের বিধি ১৯৭৩ সংশোধন করে ব্যক্তিমালিকানাধীন ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রকে ক্যাপটিভ খনি সৃজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সংশোধনী মেনে নিয়েছিল। ঠিক এখান থেকেই রাষ্ট্রীয়করণ থেকে পুনরায় ব্যক্তিপুঁজির নিয়ন্ত্রণে ফিরে যাওয়ার সূচনা হয়েছিল।

কথা এখানেই শেষ নয়। লোকসান থেকে বাঁচবার নামে কয়লাশিল্পে আউটসোর্সিং-এর নকশা তৈরি হতে থাকে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কোনো কোনো খনিতে ঠিকাদারদের উৎপাদনের ভার দিয়ে দেওয়া হয়, এরা অত্যন্ত কমমূল্যে কয়লা উৎপাদন করে কোল ইন্ডিয়াকে দিয়ে দেয়। এতে বৃহৎ পরিমাণে ঠিকা শ্রমিকদের অবদান আছে, যাদের মজুরির হার সম্পূর্ণভাবে ঠিকাদারের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। কয়লাশিল্পে এই ঠিকাদারি প্রথার মাধ্যমেই আজ ৫০ শতাংশেরও বেশি উৎপাদন হচ্ছে। এটা কি বিনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া নয়? এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হবার পরিবর্তে এই প্রক্রিয়াকে একটু আধটু বদলে মেনে নিয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং কর্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হয়েছিল। এর বিরোধিতা করায় রানিগঞ্জের কয়লাখনি শ্রমিক নেতা হারাধন রায়কে তাঁর সংগঠন সিটুতে একঘরে হতে হয়েছে। শ্রমিক সাধারণ খুশি ছিল এই ভেবে যে কোল ইন্ডিয়ার লোকসান বন্ধ হবার ফলে তাদের সুবিধার কোনো হ্রাস ঘটবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে লড়াই কীভাবে শক্তিশালী হবে?

অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকল আর বাড়তে লাগল ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা। রাষ্ট্রীয়করণের সময়ে স্থায়ী মজুরের সংখ্যা ছিল সাত লাখ, এখন সেই সংখ্যা মাত্র সাড়ে তিন লাখ। অথচ উৎপাদনের পরিমাণ সাত কোটি টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে সাতচল্লিশ কোটি টনে, যার ৫০ শতাংশই উৎপাদন করেছেন ঠিকা শ্রমিকের দল। নতুন আর্থিক নীতি স্থায়ী শ্রমিক এবং ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন আরও বাড়তে সাহায্য করেছে। দুই শ্রেণীর শ্রমিকের বেতনমান আলাদা, সামাজিক অবস্থা পৃথক, আন্দোলনের বিষয়ও আলাদা। শুধু যে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্যই এই বিভাজন সৃষ্টির প্রয়োজন তা নয়, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধি করে শাসন জারি রাখার এ এক পুরোনো পদ্ধতি। শ্রমিক শ্রেণীকে কব্জায় রাখার জন্য স্থায়ী ও ঠিকা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যাতে শ্রমিক শ্রেণী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আলাদা আলাদা সুবিধার জন্য প্রার্থী হয়ে পড়ে। অন্তত কোল ইন্ডিয়াতে স্থায়ী শ্রমিকরা ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়বেন এবং চাকরি খোয়াতে বাধ্য হবেন। সমস্ত শ্রমিকবর্গের ওপর এ এক আক্রমণ। এই আক্রমণের বিরোধিতার সাথেই নতুন অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। দুই শ্রমিকগোষ্ঠীর দাবি হওয়া উচিত যে কয়লাখনিতে পুঁজিপতি নয়, শ্রমিকরাই নিয়ন্ত্রক হবে। এটাই হতে পারে দুই শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যের সূত্র।

সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল মজদুর সংগঠনগুলির ভ্রান্ত রাজনীতিকরণ। লক্ষ্য করা যায় যে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ইউনিয়নগুলি সমাজপরিবর্তন বিষয়ে চর্চার বদলে সুবিধালাভ বা লোকসানের আলোচনা করছে, চর্চা চলছে কেবলমাত্র সুবিধালাভের পথ খোঁজার। এই প্রবণতা শ্রমিকশ্রেণীকে ক্রমশ ভোগবাদে আসক্ত করে তোলে আর শ্রমিকনেতা ভোগবাদে

অংশ নিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করে। এই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলির মতোই শ্রমিকসংগঠনগুলিও কামিয়ে খাওয়ার প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর কাছেও সংগঠনগুলি চাঁদার পরিবর্তে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কেন আর শ্রমিকশ্রেণী বা শ্রমিক সংগঠনগুলি কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে বা দেশহিত সম্পর্কে লড়াইয়ের পথ অবলম্বন করবে? শ্রমিক আন্দোলনের জগতে বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলির পার্থক্য এই যে, বামপন্থী সংগঠনগুলি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের ওপর জোর দেয়, আর সেই চেতনা হল সমাজবাদী চেতনা। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলির কাজ হল শ্রমিকশ্রেণীকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের পুঁজিবাদের প্রতি আসক্ত করে তোলা। লড়াইয়ের পথেই শ্রমিকশ্রেণী দুই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। লড়াই যদি একই রকমের হয়, তবে দুই ভিন্ন ধরনের পথ কেন হবে? এই কারণেই বামপন্থী সংগঠনের সদস্যরাও পুঁজিবাদের আক্রমণের সম্পর্কে সচেতনতা হারিয়ে দুই ভিন্ন মতবাদী সংগঠনকে একই দৃষ্টিতে দেখছে। বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলি যৌথভাবে হরতালের ডাক দিলে তা নিশ্চিতভাবেই সফল হয় কিন্তু তার লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। কয়লাখনি ক্ষেত্রে গত ৬ই জানুয়ারি হরতালের সময়ে এটাই ঘটেছিল। সফলতার সঙ্গে হরতাল শুরু হলেও সামান্য আশ্বাসের ভিত্তিতেই দেড়দিনের মধ্যে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়। নতুন অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে সমঝোতার টানাপোড়েনে পর্যবসিত হয়। এর ফলে দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলির লাভ হয়েছে কারণ তারা পুঁজিবাদের সমর্থক, আর ক্ষতি হয়েছে বামপন্থীদের কারণ সমাজবাদী রাজনীতির পরাজয় ঘটেছে।

বামপন্থী সংগঠনগুলির বড়ো প্রশ্ন এই যে, আর্থসামাজিক সংকট থেকে বাঁচবার পথ কী? স্থায়ী মজুরদের দাবিদাওয়া নিয়ে কথা না বললে সংগঠনের অস্তিত্বই সংকটে পড়ে, কারণ স্থায়ী মজুরদের মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব। আবার সুবিধা পেতে পেতে শ্রমিক সুবিধাবাদী শ্রেণীতে পরিবর্তিত হয়ে সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পথ কোথায়? বেতনবৃদ্ধির জন্য 'লাল পতাকা' আর নির্বাচনের জন্য 'পদ্মফুল'। বর্তমান কয়লাখনি-ক্ষেত্রে এই হল রাজনৈতিক চিত্র।

এই সমস্ত কারণেই কয়লাখনি ক্ষেত্রে নয়া আর্থিকনীতির বিরুদ্ধে লড়াই দিশাহীন হয়ে পড়েছে। তামাম দুর্বলতা পরিহার করে শ্রমিকশ্রেণীকেই এই লড়াইতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। শ্রম আইনের সংশোধন, জমি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধন আর সর্বশেষ খনিসংক্রান্ত আইনের সংশোধন, আক্রমণের লাগাতার ধারাবাহিকতা চলছে। এ শুধু আমাদের অর্জিত অধিকারের ওপর নয়, দেশের ভবিষ্যতের ওপর আক্রমণ। বিদেশি কোম্পানিগুলি কেবল কয়লার মজুদ সম্পদ ও বাজারের ওপরই নয়, আমাদের সমস্ত দেশীয় সম্পদের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করতে আগ্রহী। পরোক্ষে দেশকে শাসন করতে চায় ওরা। এই অর্ডিন্যান্স দাসত্বের অর্ডিন্যান্স। এই লড়াই বিদেশি কোম্পানি ও তার দেশীয় অনুচরদের পরাস্ত করবার লড়াই। এই লড়াই আজ আর কেবলমাত্র কয়লাখনিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, দেশের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের অংশ হয়ে উঠেছে, যে লড়াইতে কয়লাখনি শ্রমিকসমাজকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। নিজস্ব বেতনবৃদ্ধি, বোনাস, পেনশনের দাবির উর্ধ্বে উঠে দেশরক্ষার লড়াইতে সামিল হতে হবে। কয়লাখনি শ্রমিক আর দেশের সমগ্র শ্রমিক সমাজের এক যৌথ সংগ্রাম দেখবার জন্য দেশ আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

৪ নং ফর্ম

পত্রিকা সংক্রান্ত ঘোষণা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (১৯৫৬)
নিয়মাবলীর ৮নং ধারা অনুযায়ী

পত্রিকার নাম ❑	অনীক
প্রকাশের স্থান ❑	প্রযত্নেঃ পিপল্স বুক সোসাইটি ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার কলকাতা ৭০০০০৯
প্রকাশকাল ❑	মাসিক
প্রকাশক, মুদ্রক ও স্বত্বাধিকারী ❑	মীরা চক্রবর্তী
জাতীয়তা	ভারতীয়
ঠিকানা	শ্যামবিহার, ব্লক ৫, ফ্ল্যাট ১/ডি রঘুনাথপুর, কলকাতা - ৫৯
সম্পাদক ❑	প্রণব কুমার দে
জাতীয়তা	ভারতীয়
ঠিকানা	২৩৮, মানিকতলা মেইন রোড ফ্ল্যাট নং ১৬, কলকাতা - ৫৪

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : মীরা চক্রবর্তী

মনন

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ষান্মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : মতিলাল দেবনাথ

আদি সপ্তগ্রাম (পি সি সেন-এর মাঠ)
পোঃ- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১৪৮
ফোন - ৯৪৩২০৬৩৭৩৩

প্রবন্ধ

দেশটাকে গিলে খাবে জমি অধিগ্রহণ আইন

প্রণব দে

সাম্প্রতিক কালে মোদী সরকার অনেকগুলি অধ্যাদেশ তথা অর্ডিন্যান্স জারি করলেও, সব থেকে বেশি সোরগোল দেখা দিয়েছে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অধ্যাদেশটিকে ঘিরে। কয়লাখনি অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি, মায় বিজেপি প্রভাবিত বিএমএস-ও, পাঁচদিনের লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়ে, দু'দিনের মধ্যে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে তাদের কর্তব্য সেরেছিল। বিমা অধ্যাদেশে ৪৯ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও, কার্যত সেরকম কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করা যায়নি। কিন্তু জমি অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে বিরোধীরা কোমর বেঁধে নেমেছে। শুধু বিরোধীরা নয়। এনডিএ শরিকরাও এত কড়া অর্ডিন্যান্স হজম করতে পারছে না। শিবসেনা খোলাখুলি বিরোধিতা শুরু করেছে। অকালি দল, রামবিলাস পাশোয়ানের এলজেপি— এরাও দ্বিধাগ্রস্থ। দিল্লি-নির্বাচনে বিজেপি-র শোচনীয় পরাজয়ের জন্য আরএসএস-এর কোনো কোনো অংশ জমি অধ্যাদেশকেই দায়ী করছে। অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে অনেকদিন পর আন্না হাজারে দিল্লির ময়দানে আবার হাজির। অন্যদিকে সরকার অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করার জন্য বদ্ধপরিকর। সংসদে ইতিমধ্যে সরকার বিল পেশ করেছে। লোকসভায় সরকারের সংখ্যাগত গরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভায় সরকার সংখ্যালঘু। এবং সেকারণে সেখানে বিরোধী পক্ষ সরকারের সঙ্গে পাঞ্জা কষার মহড়া দিতে শুরু করেছে। মোদী সরকার হুমকি দিয়েছে, রাজ্যসভায় বিল অনুমোদিত না হলে, প্রয়োজনে যৌথ সভা আহ্বান করে বিল অনুমোদন করানো হবে। মোট কথা, জমি নিয়ে এখন বেশ জমজমাট অবস্থা।

অধিগ্রহণ আইন পরিবর্তনের পটভূমি

বিরোধটা কোথায় এবং কেন বিরোধ, সেটা আলোচনার আগে, বিতর্কিত অধ্যাদেশ তথা বিলটির স্বরূপ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

বিংশ শতাব্দীর ষাট-এর দশকের পর, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আবার এক কৃষক বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তবে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। প্রথমটিকে যদি সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিদ্রোহ হিসাবে সূচিত করা হয় তো, বর্তমান পর্যায়ের বিদ্রোহকে বলা যায় কর্পোরেট ও একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী বিদ্রোহ। নব্বইয়ের দশকে নয়া উদারনীতিক অর্থনীতির ধারায় সরকার, বৃহৎ-কর্পোরেট পুঁজির চাহিদামতো দেশের জল-জমি-জঙ্গল তাদের হাতে সমর্পণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জল এবং জঙ্গল প্রধানত কৌম সম্পদ— সেখান থেকে বিতাড়িত হয় এই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যুগ-যুগ ধরে নির্ভরশীল প্রান্তিক মানুষ। আর আমাদের দেশে জমির দখলদার প্রধানত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। এদের উচ্ছেদের জন্য সরকারের হাতিয়ার ছিল ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন। কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে এই আইনের ব্যবহার এই প্রথম নয় এবং অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনও আমাদের দেশে নতুন নয়। ঔপনিবেশিক যুগেও কৃষকরা বৃহৎ কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনোত্তর যুগেও তাঁদের সংগ্রাম চলমান। তবে একবিংশ শতাব্দীর অধিগ্রহণ-বিরোধী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য তার ব্যাপ্তিতে এবং কৃষক আন্দোলনের এই দেশব্যাপী ব্যাপ্তি দেশের অনেক রাজনৈতিক সমীকরণও বদলে দিয়েছিল।

প্রথম সংশোধন প্রচেষ্টা : ২০০৭

বর্তমান পর্যায়ের কৃষক আন্দোলনের প্রধান দাবি উত্থাপিত হয়েছিল জবরদস্তি করে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। বিশেষত কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তাদের ছিল প্রবল আপত্তি। অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৬ সাল থেকে *সেজ* (SEZ) আইন চালু করেছে। হাজার হাজার হেক্টর জমি *সেজ* প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ চলছে। খনি, বাঁধ সহ উন্নয়ন যজ্ঞের বিভিন্ন প্রকল্পে সরকার লক্ষাধিক একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই অবস্থায় সামগ্রিক এই জনবিক্ষোভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইউপিএ সরকার ২০০৭ সালে, ১৮৯৪ সালের আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সেইমতো ৬ ডিসেম্বর সংসদে 'ভূমি অধিগ্রহণ (সংশোধন) আইন ২০০৭' বিল পেশ করে। একই সঙ্গে 'পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন বিল ২০০৭' পেশ করা হয়। সরকার 'জনস্বার্থের' সংজ্ঞা পরিবর্তন করে বেসরকারি কোম্পানির অনুকূলে জমি অধিগ্রহণকে বৈধতা দানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। তবে একটা শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। কোনো প্রকল্পে কেউ ৭০ শতাংশ জমি ক্রয় করলে, বাকি ৩০ শতাংশ জমি সরকার তার হয়ে অধিগ্রহণ করে দেবে। সংশোধনীতে পুনর্বাসনের একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। তবে সেটাও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। ৪০০-এর বেশি পরিবার উচ্ছেদ হলে, 'সামাজিক প্রতিক্রিয়া সমীক্ষা' (Soial Impact Survey) করার এবং তদনুযায়ী পুনর্বাসন বিবেচনা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজিত হয়েছিল। নির্ধারিত প্রকল্পে পাঁচ বছরের বেশি জমি অব্যবহৃত থাকলে, সরকার সেই জমি ফিরিয়ে নেবে। ২০০৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বিলটি লোকসভায় গৃহীত হয়। কিন্তু এপ্রিলে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা এবং পরবর্তীতে পঞ্চদশ লোকসভা গঠনের সাথে সাথে বিলটিরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় সংশোধন প্রচেষ্টা : ২০১১

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী জয়রাম রমেশ নাটকীয় কায়দায়, ২০১১ সালের জুলাই মাসে নতুন এক আইনের

খসড়া আলোচনার জন্য পাবলিক ডোমেইন অর্থাৎ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেন। সেপ্টেম্বর মাসে পুরোনো অধিগ্রহণ আইনকে প্রতিস্থাপিত করে, সংসদে সরকার 'জমি অধিগ্রহণ, পুনঃস্থাপন ও পুনর্বাসন আইন ২০১১' বিল (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011) পেশ করে। এই প্রথম, শতবর্ষ পুরাতন ১৮৯৪ সালের আইন বাতিল করে, ভিন্ন এক আইন প্রণীত হয়। ২০১১ সালের প্রস্তাবিত বিলে, 'জনস্বার্থের' সংজ্ঞা আমূল পরিবর্তন করে বেসরকারি মালিকানাধীন কোম্পানীর জন্য জমি অধিগ্রহণকে 'জনস্বার্থের' আওতাভুক্ত করা হয়। এই প্রথম ব্যক্তিগত মালিকানাধীন তথা বেসরকারি কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণকে 'জনস্বার্থ' হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। উল্লেখ করা দরকার, জনস্বার্থের সংজ্ঞা অধিগ্রহণ আইনের প্রাণবস্তু। 'জনস্বার্থের' প্রযোজ্যতার উপরই অধিগ্রহণের চরিত্র নির্ধারিত হয়। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা আসবো। জয়রাম রমেশ মহাশয় যে সব বিষয়ে জমি অধিগ্রহণকে 'জনস্বার্থ' সংজ্ঞাভুক্ত করলেন, সেগুলি সংক্ষেপে:

১) প্রতিরক্ষা, ২) রেল, হাইওয়ে, বন্দর, সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও সেচ প্রকল্পের জন্য জমি, ৩) প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য জমি, ৪) গ্রামোন্নয়ন, নগরোন্নয়ন, গ্রাম ও শহরের গরিবদের বাসস্থান, সরকার অনুমোদিত শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, গবেষণা প্রকল্পের জমি, ৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা সরকারি প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের বাসস্থান সংস্থানের জন্য জমি, ৬) সরকারের অন্যান্য প্রয়োজনে এবং পিপিপি (Public Private Partnership) প্রকল্পে ব্যবহার্য জমি, ৭) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রকল্পের জন্য জমি। তবে বলা হয়েছিল যে, পিপিপি ও বেসরকারি কোম্পানির ক্ষেত্রে অন্তত ৮০ শতাংশ মানুষের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন। এই বিলে 'সামাজিক প্রতিক্রিয়া সমীক্ষা' এবং 'পুনঃস্থাপন ও পুনর্বাসন' সংক্রান্ত দুটি পৃথক অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছিল। উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই বিলে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণের মাত্রা গ্রামাঞ্চলে করা হয়েছিল জমির বাজারদরের চারগুণ ও শহরাঞ্চলে দ্বিগুণ। কিন্তু অব্যবহৃত জমি ল্যান্ড ব্যাঙ্কে ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১০ বছর। *'সেজ' সহ ১৬টি কেন্দ্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এই অধিগ্রহণ আইনের প্রয়োগ রদ করা হয়েছিল।*

২০১১ সালের এই বিলটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্ক দেখা দেয়। বিশেষত, কর্পোরেট সংস্থাগুলি বাদে বিভিন্ন পক্ষ জনস্বার্থের সংজ্ঞা পরিবর্তনে তীব্র আপত্তি জানায়। বিলটি লোকসভার স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়। তখন স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন ছিলেন বিজেপি সাংসদ শ্রীমতী সুমিত্রা মহাজন। 'জনস্বার্থ' বিষয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির মতামত ছিল : "In view of the foregoing, the principal question that this Committee is required to address is whether there should at all be provisions in the law for the acquisition of land by the State for industrial, commercial or other for-profit enterprises or private companies. The three principal factors of production are land, labour and capital. Since there is no question of the State acquisition of labour or capital, even at the margin, why should the State at all be involved in acquiring land, which is the most precious and scarce of the three factors for production, for private enterprises, PPP enterprises or even public enterprises? ...Therefore, "public purpose" in the draft Bill should be limited to linear infrastructure and irrigation, including multipurpose dams, and social sector infrastructure, such as schools, hospitals and drinking water/sanitation projects constructed at State expense,...". 'মুনাফাকামানেওয়ালা ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণের কোনো বিধান থাকা উচিত কিনা, এটা ছিল কমিটির অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয়। কমিটি মনে করে, জমি, শ্রম আর পুঁজি— এই তিনটিই উৎপাদনের প্রধান উপাদান। শ্রম ও পুঁজি, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের প্রশ্নই ওঠেনা। তাহলে, তিনটির মধ্যে সবথেকে যা দামি আর দুর্লভ, সেই জমি কেন বেসরকারি, পিপিপি, এমনকি সরকারি সংস্থার উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণের জন্য রাষ্ট্র নিজেকে জড়াবে? সুতরাং, রৈখিক পরিকাঠামো নির্মাণ, সেচ ও তৎসহ বহুমুখী বাঁধ এবং স্কুল, হাসপাতাল, পানীয় জল, সাফাই-ব্যবস্থা ইত্যাদির ন্যায় সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণের মধ্যেই 'জনস্বার্থ' সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।' কমিটি জনস্বার্থের সংজ্ঞা থেকে বেসরকারি কোম্পানিকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করে। এই কমিটি, খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে সমস্ত কৃষিজমিকে অধিগ্রহণের পরিসর থেকে বাদ দেওয়ার এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় আইনকে আলোচ্য অধিগ্রহণ আইনের আওতাভুক্ত করার সুপারিশ করে। পাঁচ বছরের অধিক অব্যবহৃত জমি পূর্বতন মালিককে ফেরত দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। ২০১২ সালের মে মাসে স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়।

'জনস্বার্থ' সম্পর্কিত প্রস্তাব সহ স্ট্যান্ডিং কমিটির অনেক প্রস্তাবই সরকার গ্রহণ করেনি। অপরদিকে সরকারি বিলও বিভিন্ন গণসংগঠন ও অন্যান্য মহল থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বেসরকারি কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে 'সম্মতি নেওয়ার' বিধান কর্পোরেট মহল মানতে পারেনি। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিব্রত ইউপিএ সরকারের পক্ষেও সময়টা অনুকূল ছিলনা। সরকারের ভিতরে-বাইরে বিভিন্ন দলের সঙ্গে বিস্তর আলাপ-আলোচনার পর জয়রাম রমেশ ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে বর্তমান 'Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation

and Resettlement (এলএআরআর)' আইনটি সংসদে পেশ করেন এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-র সহযোগিতায় বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিলটি লোকসভায় গৃহীত হয়। ভোটাভুটির সময়ে বামফ্রন্টের দলগুলি ওয়াক-আউট করে এবং তৃণমূল বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ২০১৩ সালের এই আইনটি বিজেপি সমর্থন করলেও, নরেন্দ্র মোদী অর্ডিন্যান্স জারি করে এই আইনটিই সংশোধন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন।

নয়া আইন ২০১৩

আইন নিয়ে আলোচনা প্রায়শ সুখপাঠ্য হয় না। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে সেটা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ২০১৩ সালের এলএআরআর আইন ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনকে বাতিল করে নূতন অধিগ্রহণ আইন প্রবর্তন করেছে এবং এই আইনটিই বর্তমান বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। এলএআরআর আইনের প্রধান দিকগুলি হলো-

১) ঘোষিত উদ্দেশ্য : গ্রামসভা ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে এবং ন্যূনতম স্থানচ্যুতিতে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য স্বচ্ছ পদ্ধতিতে জমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার বা মানুষের জন্য যথাযথ ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং পর্যাপ্ত পুনর্বাসন ব্যবস্থা।

২) প্রযোজ্য ক্ষেত্র :

ক) প্রতিরক্ষা; বেসরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি হোটেল ব্যতীত বাকি সকল পরিকাঠামো ক্ষেত্র; কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র; শিল্প করিডোর, খনি, জাতীয় বিনিয়োগ ও উৎপাদন অঞ্চল (এনআইএমজেড); জল সংগ্রহ ও জল সংরক্ষণ, সাফাই; সরকারি শিক্ষা, গবেষণা প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান; ক্রীড়া, স্বাস্থ্য, পর্যটন, পরিবহন ও মহাকাশ কর্মসূচি; সরকার ঘোষিত অন্যান্য যে কোনো পরিকাঠামো প্রকল্প; প্রকল্প-ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য প্রকল্প; সরকারি গৃহ-সংস্থান প্রকল্প; পরিকল্পিত গ্রামোন্নয়ন, নগরোন্নয়ন ও শহরে-গ্রামে গরিব মানুষের জন্য বাসগৃহ; গরিব ও ভূমিহীনদের জন্য কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অথবা সরকারি কোনো প্রকল্পের ফলে বিস্থাপিত মানুষের জন্য বাসস্থান সংস্থান। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের বিধান প্রযুক্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সম্মতি দেওয়ার সুযোগ নেই।

খ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি (পিপিপি) প্রকল্প ও বেসরকারি কোম্পানি। পিপিপি-র ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ ও বেসরকারি কোম্পানির ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট জমি-মালিকের সম্মতি প্রয়োজন।

৩) পুনর্বাসন : বেসরকারি কোম্পানি, সরকার নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত বা সমপরিমাণ জমি কিনলেও, সেই কোম্পানির ক্ষেত্রে এই আইনের পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন ধারাগুলি প্রযুক্ত হবে।

৪) জনস্বার্থ : পূর্ববর্ণিত যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য, তার সমস্তটাই জনস্বার্থ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারি ও পিপিপি প্রকল্পও জনস্বার্থের অধীন।

৫) সামাজিক প্রতিক্রিয়া সমীক্ষা : প্রস্তাবিত এলাকায়, অধিগ্রহণের পূর্বে স্থানীয় পঞ্চায়েত, পৌরসংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে এবং জনশুনানীর মাধ্যমে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সমীক্ষা করা হবে। কিন্তু পরিবেশ সমীক্ষা আবশ্যিক নয়। সমীক্ষা রিপোর্ট পর্যালোচনা করবে একটি বিশেষজ্ঞ দল। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জনস্বার্থের সঙ্গে সাযুজ্য বহন করে কিনা, সে মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা বিশেষজ্ঞদের আছে, কিন্তু মতামত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সরকারও স্বাধীন।

৬) ব্যতিক্রম :

ক) এলএআরআর ২০১৩ আইনের চতুর্থ তপশিল ভুক্ত ১৩টি আইন তথা ক্ষেত্রকে এই আইনের অঙ্গীভূত করা হয়নি। বলা হয়েছিল, এলএআরআর আইনের ক্ষতিপূরণের ধারা এবং পুনর্বাসনের ধারা এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রযুক্ত হবে কিনা, তা সরকারকে এক বছরের মধ্যে ঘোষণা করতে হবে।

খ) জরুরি প্রয়োজনে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সমীক্ষা, পুনর্বাসন প্রকল্প ইত্যাদি কোনো কিছুই কার্যকর হবেনা। প্রতিরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্র ছাড়াও সংসদের অনুমোদনক্রমে অন্য যে কোনো প্রকল্প, সরকার জরুরী ঘোষণা করতে পারে।

গ) বহুফসলি কৃষিজমির ক্ষেত্রে এবং 'পেসা' (PESA) এলাকায় অধিগ্রহণ যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হবে।

৭) ক্ষতিপূরণ : নিকটবর্তী শহর থেকে দূরত্বের উপর নির্ভর করে, গ্রামাঞ্চলে ক্ষতিপূরণ জমির বাজার দরের দ্বিগুণ থেকে চারগুণ, দূরত্ব বেশি হলে, ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি পাবে। শহরাঞ্চলে ক্ষতিপূরণ জমির বাজার দরের দ্বিগুণ। ১৮৯৪ সালের পুরাতন আইনে যেখানে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদান বাকি আছে, সেখানে বর্তমান আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে।

৮) পুনর্বাসন প্রকল্প : ক) ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হলে গ্রামাঞ্চলে ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়ি অথবা অর্থমূল্য, শহরের ক্ষেত্রে পাকা ঘর বা ফ্ল্যাট অথবা ন্যূনতম দেড় লক্ষ টাকা অর্থমূল্য, খ) সেচ প্রকল্পে জমি হারালে, আর্থিক ক্ষতিপূরণের বদলে যথাসম্ভব জমি প্রদান। স্বত্বলিপি অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, কম্যান্ড এলাকায় ন্যূনতম এক একর জমি। তপশিলি পরিবারের ক্ষেত্রে ২.৫ একর অথবা অধিগৃহীত জমির সমপরিমাণ জমি, যেটা কম হবে, গ) নগরায়নের ক্ষেত্রে, ২০ শতাংশ উন্নত জমি জমিহারাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং জমিহারা ব্যক্তিরা ইচ্ছুক হলে, অধিগ্রহণ ও উন্নীতকরণ বাবদ খরচের দামে, অধিগৃহীত জমির আনুপাতিক হারে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সেই জমি বণ্টন করা হবে। ক্ষতিপূরণের টাকা থেকে বণ্টিত জমির দাম কেটে নেওয়া হবে, ঘ) যে প্রকল্পে কর্মসংস্থান হবে, সেই প্রকল্পে, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের অন্তত একজনকে, যথাযথ

ট্রেনিং দিয়ে, সেই প্রকল্পে বা অন্য কোনো প্রকল্পে, কমপক্ষে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরিতে কাজ দেওয়ার সুযোগ রাখা হবে অথবা পরিবার পিছু পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হবে অথবা পরিবার পিছু ২০ বছর মাসে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে, ঙ) ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হলে, পরিবার পিছু এক বছর মাসিক ৩০০০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হবে। এ ব্যতীত 'পেসা' (PESA) এলাকায় উচ্ছিন্ন তপশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। 'পেসা' এলাকা থেকে উচ্ছিন্ন মানুষদের সমধর্মী বাস্তুতান্ত্রিক এলাকায় পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হবে, চ) প্রতি উচ্ছিন্ন পরিবারকে, পরিবহন খরচ বাবদ এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

৯) **অব্যবহৃত জমি প্রত্যর্পণ** : অধিগৃহীত জমি পাঁচ বছরের বেশি অব্যবহৃত থাকলে, সেই জমি পূর্বতন মালিককে বা তার উত্তরাধিকারকে প্রত্যর্পণ করা হবে অথবা সরকারের ল্যান্ড-ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত হবে।

মোদী সরকারের অধ্যাদেশ

২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নয়া আইন কার্যকর করা হয়েছিল। সম্ভবত দেশের কোনো রাজ্যই নয়া আইন প্রয়োগ করার সুযোগ এখনও পায়নি। তথাপি নরেন্দ্র মোদী সরকার, ক্ষমতায় আসার সাত মাসের মধ্যে আইনটি ব্যাপক রদবদলের জন্য অধ্যাদেশের আশ্রয় নিল। সরকারের মুখপাত্র হিসাবে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বিজেপি-র ওয়েবসাইটে জানালেন, ''এলএআরআর আইন বহির্ভূত ৪র্থ তপশিলের ১৩টি আইনকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫। অধ্যাদেশ জারি না করে সেটা সম্ভব নয়।'' ২০১৪ সালের জুলাই মাসে সংসদের অধিবেশন বসেছিল। মোদী সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন। সরকার যদি এতই তৎপর, তখন শুধুমাত্র এই বিষয়ে একটা বিল এনে পাশ করালো না কেন? সেটা তো অসম্ভব কিছু ছিলনা। আসলে এটা তো ছুতো মাত্র। আসল কথাটা অরুণ জেটলি পরে বলেছেন, ''১৮৯৪ সালের আইন একবিংশ শতাব্দীতে সংশোধিত হলো, অতএব তা এখন একবিংশ শতাব্দীর মতোই ক্ষতিপূরণ দেবে আর একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের চাহিদা পূরণ করবে।'' তাই একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা পূরণ করতে অধ্যাদেশ শুধু ১৩টি আইনের নিয়মিতকরণেই থেমে থাকেনি, এলএআরআর ২০১৩ আইনটিকে মৌলিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। অধ্যাদেশ অনুসারে গত ফেব্রুয়ারি মাসে লোকসভায় বিল পেশ করা হয়েছে। সেই বিলের প্রস্তাবিত মৌলিক সংশোধনীগুলি সংক্ষেপে এইরকম-

১) 'Private Company' শব্দবন্ধটি তুলে দেওয়া হয়েছে। বদলে ব্যবহৃত হবে 'Private Entity' শব্দদ্বয়। 'Private Entity'-র অর্থ সরকারি সংস্থা ব্যতীত যে কোনো ব্যক্তি-মালিকানাধীন, অংশীদারি কোম্পানি, নিগম, অলাভকারী অথবা বৈধ যে কোনো সংস্থা। এদের সবার জন্য জমি অধিগ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো।

২) বেসরকারি হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হোটেল এলএআরআর ২০১৩ আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান বিলে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবং এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে জমি-মালিকদের সম্মতি ব্যতিরেকে অধিগ্রহণ করা যায়।

৩) মোদী সরকার নূতন একটি পরিচ্ছেদে পাঁচটি ক্ষেত্র যুক্ত করেছে, যেখানে জমি-মালিকদের বিনা সম্মতিতে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণে কোনো বাধা থাকছে না। 'সামাজিক প্রতিক্রিয়া সমীক্ষাও' হবেনা। ক্ষেত্রগুলি হলো— ক) প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রতিটি প্রকল্প, প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও উৎপাদন, খ) বিদ্যুদায়ন সহ গ্রামীণ পরিকাঠামো, গ) সুলভ গৃহ প্রকল্প ও দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহ, ঘ) শিল্প করিডর, ঙ) সরকারি-বেসরকারি (পিপিপি) উদ্যোগ সহ পরিকাঠামো ও সামাজিক পরিষেবা প্রকল্প।

৪) যে ১৩টি ক্ষেত্র নিয়ে মোদী সরকারের ভীষণ ভাবনা ছিল, সেগুলির ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে কিছু সীমাবদ্ধ প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট করা হলো। আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসিত এলাকায় নির্দ্দিষ্ট পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এই ১৩টি ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। কিন্তু জমি বিনা সম্মতিতে অধিগ্রহণে কোনো বাধা নেই।

৫) এলএআরআর ২০১৩ আইনে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান অথবা অন্যান্য আধিকারিক কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে বিচারের জন্য সোপর্দ করার বিধান রাখা হয়েছিল। সংশোধনীতে, সরকারের অনুমতি ব্যতীত, এরূপ ক্ষেত্রে, আদালতের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৬) অধিগৃহীত জমি পাঁচ বছর পর্যন্ত অব্যবহৃত থাকলে, ১০১ ধারায় সেই জমি পূর্বতন মালিকদের ফেরত দেওয়ার যে বিধান ছিল, বর্তমান বিল সেটাকে প্রকৃতপক্ষে নাকচ করে দিয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, 'পাঁচ বছর অথবা প্রকল্প নির্মাণের সময়, যেটা পরে', সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কেন বিরোধ, কোথায় বিরোধ

ছয় বছরের মধ্যে একই বিষয়কে কেন্দ্র করে তিন-তিনবার বিল উত্থাপন এবং চতুর্থবার আবার সংশোধন— সংসদীয় ইতিহাসে সম্ভবত এটি বেনজির ঘটনা। একটা তেতো বড়ি জনসাধারণকে খাওয়াতে হলে, চিনির পলেস্তারা কতটা দিতে হবে, সেটা ঠিক না হওয়া ইস্তক আইনের খসড়া বারেবারে পরিবর্তিত হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী অবশ্য চিনির মোড়কের ধার ধারেন না। আসলে চিনি লাগানোটাকেও তিনি অপব্যয় মনে করেন। আইনের খসড়া এই যে বারেবারে পরিবর্তিত হয়েছে, তাতে মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়নি। প্রত্যেকটি বিলের মূল সুর একটাই, কর্পোরেট স্বার্থে অধিগ্রহণ আইনের পরিবর্তন। ১৮৯৪ সালের আইনে 'জনস্বার্থে' সরাসরি ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোম্পানির নামে জমি অধিগ্রহণ করা যেত না। সরকার আগে সরকারি কোম্পানি বা নিগমের নামে 'জনস্বার্থে' অধিগ্রহণ করতো, তারপর তা প্রাইভেট কোম্পানি বা সংস্থাকে লিজ দিয়ে দিত। এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চালু থাকলেও,

সাম্প্রতিক মামলা-মোকদ্দমার কারণে, সরকার বৃহৎ কোম্পানিগুলির পক্ষে আরও পাকাপাকি বন্দোবস্তের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। বিশ্বব্যাঙ্কের তরফেও জমিনীতি উদারীকরণের জন্য চাপ আসছিল। সরকারের কাছে তাই প্রাথমিক তাগিদ ছিল, 'জনস্বার্থের' সংজ্ঞা পরিবর্তন করে প্রাইভেট কোম্পানি, কর্পোরেটগুলির জন্য অধিগ্রহণ প্রত্যক্ষভাবে 'জনস্বার্থের' অঙ্গীভূত করা। বলা বাহুল্য, সরকারের এই পদক্ষেপের সঙ্গে কৃষক বিদ্রোহগুলির দাবির কোনো সঙ্গতি নেই। কত শতাংশ সম্মতি দিল, সেটা বড়ো কথা নয়। প্রশ্ন একটাই, মুনাফা-ভিত্তিক প্রকল্পকে 'জনস্বার্থ' বলা হবে কেন? বিজেপি সাংসদ সুমিত্রা মহাজন-এর স্ট্যান্ডিং কমিটি এই প্রশ্নটাই তুলেছিল, কিন্তু এই মত তাঁর দল সমর্থন করেনি। জনস্বার্থ সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত, "জনস্বার্থ নিশ্চিতভাবে সেটাই চিহ্নিত করে, যেখানে সরাসরি ও আবশ্যক রূপে ব্যক্তিবর্গের বিশেষ স্বার্থ জড়িত থাকার বিপরীতে সমষ্টির সুনিশ্চিত স্বার্থসাধনই অভীষ্ট লক্ষ্য"। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ব্যক্তি-পুঁজি নির্ভর মুনাফাভিত্তিক প্রকল্পে মুনাফাটাই লক্ষ্য, সমষ্টি গৌণ।

দ্বিতীয়ত, অধিগ্রহণের সকল ক্ষেত্রকে আগাম সম্মতি-প্রদান সীমার মধ্যে আনা হয়নি। কর্পোরেট-পুঁজি লগ্নির বিশাল এক ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি অধিগ্রহণ করবে (এই নিবন্ধের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের 'প্রযোজ্য ক্ষেত্র (ক)' দ্রষ্টব্য)। ইউপিএ সরকার 'সেজ', টেলিকমিউনিকেশন, শিল্প-করিডোর, খনি, 'এনইএমজেড' (National Investment and Manufacturing Zones), এমনকি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র সহ ব্যক্তি-পুঁজি লগ্নির একাধিক ক্ষেত্রে জমি-মালিকের বিনা সম্মতিতে অধিগ্রহণের ব্যবস্থা রেখেছিল। মোদী সরকার এর সঙ্গে যুক্ত করেছে বেসরকারি হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হোটেল। মোদী সরকারের আইনে পিপিপি পরিকাঠামো প্রকল্পও অধিগ্রহণের উন্মুক্ত ক্ষেত্র।

সুতরাং মোদী সরকারের অধ্যাদেশ জারির আগে থেকেই, বেসরকারি পুঁজি লগ্নির ব্যাপক ক্ষেত্রে বিনা সম্মতিতে অধিগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছিল। মোদী সরকার ক্ষেত্রগুলিকে আরও সম্প্রসারিত করেছে।

রাজনৈতিক দলগুলির সমঝোতা

অভিজ্ঞতা বলে, কংগ্রেস-বিজেপি সম্পর্কের এক অদৃশ্য সমীকরণ আছে। কংগ্রেস শুরু করে, বিজেপি শেষ করে। ১৯৯১ সালে কংগ্রেস সরকার নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতি প্রবর্তন করে। পরবর্তী বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার 'সাইনিং ইন্ডিয়া' শ্লোগানের আড়ালে তা উগ্রভাবে কার্যকরী করে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজির এই দুই পান্ডার মধ্যে ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই দুই দলের পার্থক্য কেবল কৌশলের।

জমি অধিগ্রহণ আইনের কাঠামোগত পরিবর্তন ইউপিএ সরকারই করে গেছে। আর এখন সংসদে বিরোধীরা শুধুমাত্র বিজেপি আনীত সংশোধনের বিরুদ্ধে সরব। রাজ্যসভায় বিজেপি সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। সেখানে সরকার হয়তো কিছুটা সমঝোতার পথে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান অধ্যাদেশ বা সংশোধনী বিল যদি বাতিলও হয়, তা হলেও কি এলএআরআর আইনের চরিত্র গণতান্ত্রিক হবে অথবা কৃষক আন্দোলন থেকে উত্থিত চাহিদাগুলি মিটবে? সরকার যেটা করেছে, কর্পোরেট সেক্টরের জমির ক্ষুধা মেটাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়েছে। যদিও কোনো ক্ষতিপূরণই জীবন ও জীবিকা বিপর্যয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এমনকি, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও আর্থিক অনুদান দিয়েই সরকার কর্তব্য সমাপন করবে, ছিন্নমূল মানুষের প্রকৃত পুনর্বাসন হবেনা। আগাম সম্মতির যে বিধান আছে তা সার্বিক নয়, আংশিক। উন্মুক্ত ক্ষেত্র যা আছে, তাতেই বৃহৎ পুঁজির কার্যসিদ্ধি হবে। সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি এই বিষয়গুলো আলোচনায় আনছে না।

একটা বিষয় খুব পরিষ্কার, বর্তমান কর্পোরেটমুখী উন্নয়নের উপাসনা করে, বিজেপি-র জমিনীতির বিরোধিতা করা যায়না। করলে সেটা হবে ভাবের ঘরে চুরি। কংগ্রেসের কথা ছেড়েই দিলাম, সিপিএম কি বলতে পারবে, সিঙ্গুরে জোর করে জমি অধিগ্রহণ করা তাদের ভুল হয়েছিল? তারা কি স্বীকার করবে, নন্দীগ্রামে বিশাল এলাকা সালেমের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা তাদের অন্যায় হয়েছিল? *সেজ*, *এনইএমজেড* আইন/নির্দেশিকা বাতিলের দাবি কি সংসদে উঠছে? মৌলিক অর্থনৈতিক বিষয়গুলিতে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এক অদৃশ্য সমঝোতা কাজ করছে।

কোথায় জনস্বার্থ?

সম্প্রতি, ২০১৪ সালে, ভারত সরকারের 'কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (*ক্যাগ*)' বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (*সেজ*) সম্পর্কিত যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতে অর্থনীতির উন্নয়ন দূরে থাক, অবনমনের চিত্রটাই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। *সেজ*-এর জন্য 'জনস্বার্থে' ৪৫৬৩৫.৬৩ হেক্টর জমি অধিগৃহীত হয়েছিল। তার মধ্যে ৬২.৪২ শতাংশ জমি (২৮৪৮৮.৫ হেঃ) *সেজ*-এর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৪ শতাংশ জমি (৫৪০২ হেঃ) ইতিমধ্যেই *সেজ*-বিমুক্ত হয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিনিয়োগের যা প্রতিশ্রুতি ছিল, তার মাত্র ৪১ শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছে। ঘোষিত কর্মসংস্থানের তুলনায় মাত্র ৮ শতাংশ কর্মসংস্থান হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রপ্তানি হয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশ। আর এই '*সেজ*'-এর জন্য ভারত সরকারকে কর ছাড় দিতে হয়েছে ১,৭৫,৪৮৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই টাকাটাও *সেজ*-মালিকদের পকেটে ঢুকেছে। এই যখন *সেজ*-এর অবস্থা, ভারত সরকার তখন 'এনইএমজেড ২০১৩' নীতি ঘোষণা করে। *সেজ*-এ যেখানে ন্যূনতম ১০০০ হেক্টর জমি লাগতো, *এনইএমজেড*-এর ক্ষেত্রে সেখানে লাগবে কমপক্ষে ৫০০০ হেক্টর জমি। অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজিকে আরও বেশি ছাড়, আরও বেশি জমি লুঠের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সিঙ্গুরে কারখানা হলো না বলে, অনেকে হা-হুতাশ করেন।

অন্যদিকে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলায় বছরের পর বছর বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো জমি ফেলে রেখেছে। শালবনীতে বিশাল পরিমাণ জমি নিয়েও জিন্দালরা কোনো শিল্প করলো না। সেখানে কোনো প্রশ্ন উঠছেনা। কর্পোরেট মালিকরা বাজারের দোহাই দিয়ে পুঁজির নিরাপত্তা খুঁজছে। প্রান্তিক মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? আগামী এক দশকে প্রায় ১.৮০ কোটি একর জমি উন্নয়নের খাদ্য হবে এবং তা ভারতবর্ষের মোট কৃষিজমির প্রায় ৮ শতাংশ (সারণি দ্রষ্টব্য)। এই সব অধিগ্রহণ কোন্ জনস্বার্থ চরিতার্থ করেছে বা করবে?

একটাই দাবি : ব্যক্তি-পুঁজির বিযুক্তিকরণ

অধিগ্রহণ আইনের আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জমি-মালিকদের সম্মতি যদি নেওয়া সম্ভব হয় তো, কিনে নেওয়া কেন সম্ভব হবেনা? তার থেকেও বড়ো প্রশ্ন, বৃহৎ পুঁজির জন্য জমি জোগাড়ে সরকার কেন এজেন্টের ভূমিকা নেবে? বৃহৎ পুঁজির আক্রমণ ও জমি-লুঠ প্রতিহত করার জন্য, গণমুখী উন্নয়নের জন্য, আশু যে দাবি এখনই তোলা উচিত, তা হলো, ''সকল প্রকার ব্যক্তি-পুঁজি ও বাণিজ্যিক সংস্থাকে অধিগ্রহণ আইন থেকে বিযুক্ত করতে হবে। লাভজনক কোনো প্রকল্পই জনস্বার্থের অঙ্গীভূত হবেনা।'' অধিগ্রহণ আইন থেকে কর্পোরেট পুঁজিকে বিযুক্ত না করতে পারলে, এই আইন দেশটাকেই গিলে খাবে।

বর্তমান যারা সাংসদ, তারা এই দাবি তুলবে না। এই দাবি তোলার দায় সাধারণ মানুষের, যারা বৃহৎ পুঁজির আক্রমণের লক্ষ্য এবং নয়া উদারনীতির শিকার। মোদী সরকারের বিল সংসদে খারিজ হওয়ার প্রয়োজন আছে। না হলে আক্রমণ আরও তীব্র হবে। কিন্তু সংসদে বিরোধিতার থেকে সমঝোতার রাজনীতি বেশি কাজ করে। ইতিমধ্যেই বিমা বিল কংগ্রেসের সহযোগিতায় সংসদে পাশ হয়ে গেছে। কয়লা বিলও পাশ হয়ে যাবে। লোকসভায় ভোটাভুটির আগে সরকার জমি অধিগ্রহণ বিল কিছুটা সংশোধন করার প্রয়াস নিয়েছে। বেসরকারি হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আবার অধিগ্রহণ আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিল্প করিডোরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, রাস্তার দুপাশে এক কিলোমিটারের বেশি অধিগ্রহণ হবেনা ইত্যাদি। তাতে অধিগ্রহণ আইনের জনবিরোধী চরিত্রের কিছুমাত্র বদল হয়নি।

দেশের মানুষ কি প্রত্যাঘাত করবে না?

বিকাশমান ক্ষেত্রগুলিতে জমির চাহিদা (হেক্টর)

ক্ষেত্র (২০২৬ পর্যন্ত)	*উপক্ষেত্র*		*জমির চাহিদা*	
		২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত	*ভবিষ্যত চাহিদা*	*মোট পরিমাণ*
শস্য-জ্বালানি	জ্যাট্রোফা	৫,০০,০০০	৩৯,০০,০০০	৪৪,০০,০০০
	জৈবশক্তি	২,৭৩,৭০০	১৭,২৬,৩০০	২০,০০,০০০
পরিকাঠামো	রাস্তা	১৮,১৬,৩৫৫	১৩,০০,৬৪৫	৩১,১৭,০০০
	বাঁধ	২৯,০৭,০০০	১০,০১,১৭১	৩৯,০৮,১৭১
	সেজ	৮৬,১০৭	৬৩,৮৯৩	১,৫০,০০০
খনি	কয়লা	১,৪৭,০০০	৩,৮৮,৪৪৫	৫,৩৫,৪৪৫
	লোহা	৮৮,০৬৫	২,৩২,৭১০	৩,২০,৭৭৫
	বক্সাইট	৩০,০৫৯	৭৯,৪৩০	১,০৯,৪৮৯
	চুনাপাথর	১,৪৪,৯৭৯	৩,৮৩,১০৪	৫,২৮,০৮৩
	অন্যান্য খনিজ	২,৪৪,৩০১	৬,৪৫,৫৬১	৮,৮৯,৮৬২
অপ্রচলিত শক্তি (২০৩২ পর্যন্ত)	বায়ু	১,৮০,০০০	৩,৬০,০০০	৫,৪০,০০০
	সৌর	৭৬	৯৯,৯২৪	১,০০,০০০
	মোট	৬৫,১১,২৬৬	১,১৪,৪৭,৫৫৯	১,৭৯,৫৮,৮২৫

সূত্র : Undemocratic and Arbitrary : Control, Regulation and Expropriation of India's Forest Commonlands-Shankar Gopalakrishnan 2012[১]

১ জানু-ফেব্রু, ২০১৪ সংখ্যায় লেখকের 'ভূমিজীবী মানুষের ভূমি অধিকার' প্রবন্ধে ব্যবহৃত এই সারণী এবং হিসাবে কিছু ত্রুটি ছিল। বর্তমান সারণীটি সংশোধিত এবং সঠিক। পূর্ব ত্রুটির জন্য লেখক দুঃখিত।

প্রবন্ধ

রাশিয়ার ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন

সুচরিতা সেন

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ। তার সমাজবাদের অভিজ্ঞতা দীর্ঘতম। এই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গোটা সোভিয়েত ব্লকের ভেঙে পড়া নিঃসন্দেহে বিশ্ব বামপন্থার পক্ষে এক ঐতিহাসিক পরাজয়। মার্কস বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাস বলতে বোঝায় শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সাধারণভাবে এ কথার সত্যতা নিয়ে সংশয় নেই। বিশেষ করে ১৭৮৯ থেকে ১৯৮৯, বাস্তিলের পতন থেকে বার্লিন প্রাচীরের পতন যে মূলত শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, সে কথা প্রায় নিশ্চিত। অবশ্যই দেশ কাল অনুসারে সে সংগ্রাম নানা রূপ নিয়েছে। ফরাসি বিপ্লব ছিল চরিত্রগত দিক দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। অন্তত তা বুর্জোয়া উন্নয়নের পথ খুলে দিয়েছিল। আবার তার মধ্যে নিহিত ছিল সমাজতন্ত্রের বীজ, ভবিষ্যতে তা রূপান্তরিত হয়েছিল মহীরূহে। অঁরাজে গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বা বারফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা তার প্রমাণ। ১৯৮৯-এ বামপন্থার প্রগতিশীল ধারার পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে, অন্তত ইউরোপীয় ভূখণ্ডে। পরবর্তী বছর দুয়েকের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্র রূপে মুছে যাওয়াতে এই পরাজয় আরো ঘনীভূত হয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি মর্মাহত হওয়ার কারণ আছে? সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ডানিয়েল সিঙ্গার মন্তব্য করেছেন, এ যেন শূন্য কবরের পাশে অশ্রুপাত। যা ছিল, যাকে 'বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্র' বলা হতো, তা ছিল সমাজবাদের প্রকৃত মর্মবস্তু থেকে শত যোজন দূরে। বরং এখনই প্রকৃত সমাজতন্ত্র গড়ার সুযোগ এসেছে। আরো অনেকে তাঁর সাথে একমত ছিলেন। অবশ্য সিঙ্গার পরে তাঁর ভুল স্বীকার করেছেন। পুরনো সমাজতন্ত্র যাই হোক না কেন, তার সমাধিক্ষেত্রে কোন নব বা প্রকৃত সমাজতন্ত্রের চারাগাছ জন্ম নেবে না। মনে করা হয়েছিল, সোভিয়েত শিবিরের ডিসিডেন্ট বা প্রতিবাদীরা চায় উন্নততর সমাজতন্ত্র। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে, এই তথাকথিত প্রতিবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল পুঁজিবাদই নয়, পুঁজিবাদের সব চেয়ে হিংস্র, প্রতিক্রিয়াশীল রূপ কায়েম করা। সেই সঙ্গে ন্যাটো (NATO) নামক পশ্চিমা সামরিক জোট ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে সৈন্য হয়ে যে কোনো দেশে লড়াই করা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের চরিত্র কী ছিল, তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। বিকৃত সমাজতান্ত্রিক, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী, শোধনবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী, বা অন্য কিছু। যাই হোক, 'ব্র্যান্ড' নাম ছিল সমাজতন্ত্র। এ নাম মুছে ফেলার ফলে কেবল যে ভূতপূর্ব বাম ব্লকে নয়া উদারবাদ কায়েম হয়েছে তাই নয়, যে সব বাম শক্তি ব্লকের বাইরে ছিল, তারাও মারাত্মক আঘাত পেয়েছে। যেমন, পশ্চিম ইউরোপে কিছু শক্তিশালী কম্যুনিস্ট দল। এমন কি পশ্চিমা সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলগুলিও তাদের মধ্যে যেটুকু বামপন্থা ছিল, তা হারিয়েছে। সাইনবোর্ড পাল্টানো বা প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, এই যেন পশ্চিমের সব রঙের বামপন্থীদের নিয়তি। অথচ এরা যে সবাই সোভিয়েত ভক্ত ছিল, এমন নয়।

এখন কী অবস্থা রাশিয়ার? পুনর্জন্ম লাভ করা ধনতন্ত্র সেখানে কী রূপ নিয়েছে? আগে কী ছিল, এক নজরে দেখা যাক। জারিস্ট আমলে রাশিয়া ছিল রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে এক বৃহৎ শক্তি। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে খুবই পশ্চাৎপদ, প্রায় মধ্যযুগীয়। যদিও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোথাও কোথাও দ্রুত শিল্পায়ন হয়েছিল। জন্ম নিয়েছিল অত্যাচারিত ও বঞ্চিত এক শ্রমিক শ্রেণী, যারা রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত টলিয়েছিল। গৃহযুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, চোদ্দ রাষ্ট্রের আক্রমণ, এসব দুর্বল অর্থনীতিকে প্রায় শেষ করে ফেলেছিল। সোভিয়েত আমলে নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে প্রায় অবিশ্বাস্য হারে অগ্রগতি ঘটেছিল। তবে ব্রেজনেভ যুগের শেষ দিকে, সত্তরের দশকের শেষে ও আশির দশকের গোড়ায় কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। অথবা বলা যেতে পারে, পুরনো সমস্যা আরো বড় হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। পরিবর্তন আনতে হাল ধরলেন গর্বাচভ।

গর্বাচভ ক্ষমতায় এসে 'গ্লাসনস্ত' ও ' পেরেস্ত্রইকা' নামে দুটি কথা ঘোষণা করে সারা দুনিয়া তোলপাড় করলেন। কিন্তু এর সঠিক অর্থ কেউ নিশ্চিত ভাবে জানত না। বোধ হয় গর্বাচভ নিজেও নয়। এইটুকু কেবল বোঝা গেল যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হবে। বাজারের উপর অধিক নির্ভর করা হবে। এমন পরীক্ষা নিরীক্ষা অবশ্য আগেও হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি বোঝা গিয়েছিল, সাবেক আমলের পরিকল্পনা পুরোপুরি কাজ করছিল না। অর্থনীতির ভাষায়, উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর অনেক সময় হয় ব্যাপক (এক্সটেনশিভ), বহির্মুখী। উৎপাদনের বিভিন্ন দিক, ফ্যাক্টর, জমি, অর্থ, শ্রম ইত্যাদি একত্রিত করে সংগঠিতভাবে শক্ত হাতে পরিচালনা করলে সুফল পাওয়া যায়। যেমন সোভিয়েত অর্থনীতি লাভ করেছিল আশাতীত সুফল, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে। কিন্তু আরো উন্নত অর্থনীতির ক্ষেত্রে দরকার হয় আরো সূক্ষ্ম, নিবিড় ব্যবহার। অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের গুণগত মান বৃদ্ধি। ক্রুশ্চভ আমলে দেখা গেল, পরিকল্পিত অর্থনীতি উৎপাদন দ্রুত হারে বাড়াচ্ছে, কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের একাংশ বাজার পাচ্ছে না। এক সোভিয়েত ব্যঙ্গপত্রিকায় কার্টুন প্রকাশ করল একটি বিরাট পেরেকের, বৃহৎ কিন্তু অবাঞ্ছিত। যেন সোভিয়েত অর্থনীতির প্রতীক। আর

এদের সাথে মূল্য যোগ করার জন্য কিছু বিচিত্র উপায় বার করা হয়েছিল। যেমন জামাকাপড়ে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কারুকার্য।

অর্থনীতির বৃদ্ধির সঙ্গে তার শাখাপ্রশাখা সম্বন্ধে খবরাখবর পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। অথচ এটা ছাড়া পরিকল্পনা করা ছিল কঠিন। গর্বাচভের এক অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা আর একটি সমস্যার কথা তুলেছিলেন। পরিকল্পনা পর্বের প্রথম দিকে প্রায় সব উদ্যোগ-পরিচালক বেশি বেশি অর্থ শ্রম কাঁচামাল ইত্যাদি দাবি করতেন। কারণ শেষ দিকে যদি কম পড়ে যায়! আগে থেকে জমিয়ে রাখা ভাল। ফলে শেষে সর্বত্র টান পড়ত।[১] এখন আইটি ও কম্পিউটারের যুগ সবে শুরু হতে চলেছে, অন্তত বড় মাপে। কোনো কোনো সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ 'ইনফর্মেশন' ছড়ানোর জন্য এদিকে তাকাচ্ছিলেন। ১৯৬৫ সালে লিবারম্যান সংস্কারের মাধ্যমে পরিকল্পনার মধ্যে বিনিয়ন্ত্রণ ও বাজারের বীজ অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা হয়েছিল। তাছাড়া দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তি হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নে ভোগ্যপণ্য কম, দোকানের সামনে লাইন। যারা মহাকাশে মানুষ পাঠায় তার ভাল মাজন বানাতে জানে না, এমন অভিযোগ তো ছিলই। বস্তুত, ভোগপণ্যের প্রাচুর্য ছিল, তথাকথিত স্বাধীনতা ছাড়া, পশ্চিমের তুরুপের তাস। বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর কিছু দিন পশ্চিম জার্মান ধনকুবেরেরা পূরবীয়াদের বিনামূল্যে ভোগ্যপণ্য দিত। এই দান খয়রাত যে চিরকাল চলবে না, সে কথা বোধহয় সরল গ্রহীতাদের মনে হয় নি। ইয়েল্টসিন না কি মার্কিন সুপারমার্কেট দেখে পুঁজিবাদে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

গর্বাচভ আমলের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা এখানে করব না। তিনি নির্বোধ ছিলেন, না বিশ্বাসঘাতক, সে বিতর্ক বোধ হয় অনন্ত কাল চলবে। এইটুকু বলা যেতে পারে, তিনি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছিলেন। ১৯৯০ সালে ঘোষণা করা হলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাজার অর্থনীতিতে ফিরে যাবে। পুঁজিবাদ কথাটা তখনো জনপ্রিয় হয় নি। কিন্তু ঠিক কী করতে হবে তাও নিশ্চিত ছিল না। কেমন করে হবে তা তো দূরের কথা। আশির দশকে সোভিয়েত কর্তাব্যক্তিদের অনেকে হয়ত মাও-উত্তর চীনকে 'রোল মডেল' বানিয়েছিলেন। কিন্তু গর্বাচভ আদৌ দেঙ শিয়াও পিং ছিলেন না। তাঁর সমস্যা যে আরো গভীর ছিল, এ কথাও স্বীকার্য।

গর্বাচভ আমল থেকে প্রচার শুরু হয়েছিল, সোভিয়েত আমল প্রায় সবটাই নেতিবাচক। হুকুমদারির যুগ, স্থবিরতার যুগ। বিশেষ করে ব্রেজনেভ জমানা। কথাটা আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু পুরোপুরি সত্য কি? এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর কথা শোনা যাক, যিনি আদৌ স্তালিনবাদী নন:

> যুদ্ধের পরবর্তী পঁচিশ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন জীবনের মান দ্বিগুণ উন্নত করেছে, ১৯৮০ পর্যন্ত পরবর্তী দশকগুলিতে তা আরো উন্নত হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের চেয়ে বেশি শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৬৬ সালের ১.২ কোটি থেকে ১৯৮৫ সালে হয় ৪ কোটি, আর প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানীর সংখ্যা হয় পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের যোগফলের চেয়ে বেশি।[২]

পেরেস্ত্রয়কার ঠিক আগের বছরগুলিতে সোভিয়েত অর্থনীতির পশ্চিমা বিশ্লেষণ সাধারণত চলত দুটি সমান্তরাল ধারায় : একদিকে বলা হত একেবারে স্থবিরতা ও আসন্ন পতনের কথা, অন্যদিকে বলা হতো (সোভিয়েত ইউনিয়নের) বিশাল শিল্পশক্তির কথা, যা পশ্চিমের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। গর্বাচভের উপদেষ্টারা প্রথমেই এই প্রথম ধারাটিকে মেনে নিলেন। এর ফলে তাদের কথাই সত্য হলো। অন্যান্য ভদ্র বিশ্লেষকদের মধ্যে সোভিয়েত বিরোধী জোরেস মেদভেদেভ ও পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ অ্যালেক নোভে, যাঁরা গভীরভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচক ছিলেন, তাঁদের কথা বলা যেতে পারে:

> ১৯৭৯ সালে ব্রেজেনেভের শাসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মেনভেদেভ এ বিষয়ে জোর দেন যে সাইবারনেটিক্স ও কমপিউটার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে তিন বছর পিছিয়ে আছে— অনেকখানি ফারাক ঠিকই, কিন্তু সে ফারাক কমছে। কয়েক মাস পরে, নোভে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লেখেন:
>
> "এখনই কোনো বিরাট বিপর্যয় ঘটবে না। ব্যবস্থাটি বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেই। তাদের পরিকল্পনা ও তার ফলের মান নামছে না। বরং, মান আসলে উন্নত হচ্ছে... পরবর্তী চার বছরে বৃদ্ধির হার যদি মোটামুটি বছরে ৩ শতাংশও থাকে (যে ভবিষ্যদ্বাণী মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত হবে), পশ্চিমা অর্থনীতির তুলনায় সেটা হবে বেশ ভাল।"[২]

অর্থাৎ সোভিয়েত অর্থনীতির নানা সিরিয়াস সমস্যা থাকলেও জোরের জায়গাও ছিল। একেবারে ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়নি। কিন্তু গর্বাচভ অ্যান্ড কোম্পানি সে কথাই জোর গলায় বললেন আর নিজেদের ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণ করে ছাড়লেন।

গর্বাচভের পর ইয়েল্টসিনের পালা। তিনি সোভিয়েত-উত্তর রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান। সে সময় ইয়েল্টসিন ছিলেন একাধারে এক ক্রনিক রোগী ও বেহেড মাতাল। অর্ধেক সময় কাটত নার্সিংহোমে আর বাকি সময় ভদকা টেনে চুর হয়ে থাকতেন। তাঁর চারপাশে জুটেছিল একটি গোষ্ঠী, যাদের বলা হতো 'সম্মিলিত ভাবে রাসপুতিন" (রাসপুতিন ছিলেন এক অপরাধী সন্ন্যাসী। শেষ জার-জারিনার ঘনিষ্ঠ, প্রায় গুরুদেব। জারতন্ত্রের পতনের অন্তত একটি কারণ।) এদের মধ্যে ছিলেন চুচেম, নাইদর, শারমরিদিন ইত্যাদি। এরা রাশিয়ার অর্থনীতির ক্ষেত্রে দিনে ডাকাতি করে এখানে পুঁজিবাদী পথে (অন্তত

ক্ল্যাসিকাল পুঁজিবাদে) প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করেন। এর মধ্য দিয়ে নিজেরাও হলেন ধনকুবের। এদের তুলনা করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রবার ব্যারন বা ডাকাত সামন্তপ্রভু, নামে পরিচিত শিল্পপতিদের সাথে। কিন্তু মার্কিন ''দস্যু শিল্পপতিরা'' অন্তত শিল্প, কলকারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন। তাদের রুশ কাউন্টারপার্টরা কেবল সাত দশক ধরে জনগণের গড়া সম্পদ লুটপাট করেছেন।

ইয়েল্টসিনের প্রিয়পাত্ররা, নিজের পরিবার, দুই মেয়ে, তিন জামাই (এক মেয়ে দুবার বিয়ে করে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গেও সম্পর্ক রেখেছিল) হরির লুটের বড় অংশ পেয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে, ইয়েল্টসিন আমলের প্রথম দিকে, রাশিয়াতে দেখা দিল প্রবল মুদ্রাস্ফীতি। রুবলের মূল্য পাতালে নেমে গেল। টান পড়ল জমানো টাকায়। লোকের সঞ্চয় প্রায় শেষ হয়ে গেল। কয়েক বছর একটু ''আচ্ছে দিন''-এর পর (অবশ্য এ সময়েও সাধারণ মানুষের অবস্থা ভাল ছিল না) এল ১৯৯৮-এর মন্দা। এ সময় পৃথিবীর অন্যত্রও অর্থনীতিতে ধ্বস নেমেছিল। যেমন, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া। কিছু দিন আগে মেক্সিকো। মার্কিন অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ মন্তব্য করেছেন, নব্বইয়ের দশকে এত জায়গায় মন্দা সার্বিকভাবে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের দুর্বলতার নিদর্শন। রাশিয়ায় ইয়েল্টসিন মার্কা পুঁজিবাদের প্রথম দশক শুরু ও শেষ হয়েছিল অর্থনৈতিক বিপর্যয় দিয়ে।

রাশিয়া ও গোটা পূর্ব ইউরোপে নির্জলা পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আর দ্বিমত ছিল না। ''সংস্কারপ্রাপ্ত কমিউনিজম'', ''পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদের মাঝামাঝি মধ্যপন্থা'', এসব পুরনো কথা আর শোনা যেত না। তবে পুঁজিবাদের পথ নিয়ে কিছু মতপার্থক্য ছিল। পশ্চিমের যে সব আর্থিক বিশেষজ্ঞ ভাগাড়ের শকুনের মতো সমাজতন্ত্রের মৃতদেহের চারদিকে ভিড় করেছিলেন, তাদের মধ্যে সবাই একমত ছিলেন না। প্রধান বিভাজন ছিল ''ধীরে চলো'' নীতির সমর্থক আর ''শক থেরাপি''-পন্থীদের মধ্যে। প্রথম পক্ষের যুক্তি অনুমান করা সহজ। ''শক থেরাপি''-ওয়ালাদের বক্তব্য ছিল, এক্ষেত্রে স্বল্পস্থায়ী দুঃখকষ্টের পর আসবে দীর্ঘমেয়াদি লাভ। তাছাড়া যা হয়েছে তার আর পরিবর্তন হবে না।

কোনো কোনো উদ্যোগের ম্যানেজার দাবি করেছিলেন, উদ্যোগগুলি তাদের হাতেই তুলে দেওয়া হোক। ম্যানেজার নয়, খোদ মালিক হিসেবেই তারা সেগুলি পরিচালনা করবেন। অন্যরা বললেন, মালিকানা আরো ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া পুঁজিবাদ সৃষ্টির যে পথ বেছে নিয়েছিল তা এই রকম:

১৯৯২ সালে রাশিয়ার প্রতিটি ব্যক্তিকে তাঁর সোভিয়েত জন্ম-অধিকার হিসেবে দশ হাজার রুবলের একটি ভাউচার দেওয়া হয়— দশ হাজার রুবল তখন দু সপ্তাহের মজুরি। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে এর মূল্য বাড়ে নি। দরিদ্র রাশিয়ানরা বাঁচার জন্য ভাউচার বেচে দেয়, আর বড় বড় বিনিয়োগ সংস্থাগুলি নিলামে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে হস্তগত করার জন্য বুদ্ধি খাটিয়ে এই ভাউচারগুলি কিনে নেয়।

সুনির্দিষ্টভাবে না হলেও কারখানাগুলি যে একভাবে তার কর্মীদের— এই ধারণার বিষয়টি বেসরকারিকরণ প্রকল্পের রূপকারদের মাথায় রাখতে হয়েছিল। মাঝামাঝি ব্যবস্থা হিসাবে তাই তারা শ্রমিকদের তাদের সংস্থার ২০ শতাংশ মালিকানা বিনা পয়সায় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না। অন্যথায় তারা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে একযোগে ৫১ শতাংশ কিনতে পারে... এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এই নিলামের নিয়ম পাল্টে গেছে। মাফিয়ারা যখন কোনো কারখানা চেয়েছে, তাদের প্রতিনিধিদের হারানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। রাশিয়ার সংস্থাগুলি কম দামে বিক্রি হয় নি। সেগুলি যে দামে বিক্রি হয়েছে তার সঙ্গে সেগুলির আসল মূল্যের কোনোরকম সম্পর্কই নেই।

এমনকি পেরেস্ত্রয়কার পশ্চিমা সমর্থকরাও এই ''ঋণের বদলে শেয়ার'' বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিতে ছিলেন। ১৯৯৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এটি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে ২০০ কোটি ডলার জমা করার জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্র তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলি কয়েকটি বিশেষ নির্বাচিত ব্যাংকের কাছে নিলামে তোলে। এতে তারা ১০০ কোটি ডলার লাভ করে। অনেকের মতেই এটা তাদের নিজেদের টাকা (টাকা ধার করার পাশাপাশি সরকার তখন তাদের পছন্দের বেসরকারি ব্যাংকগুলিতে টাকা জমা রাখছিল, যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকেই এ টাকা রাখা যেতে পারত)।

আপনাদের হয়ত জানা আছে যে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ায় যারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল তাদের নাম ছিল মহা-সাত বা বিপজ্জনক-সাত, আপনার ভাবনাচিন্তা অনুসারে যেটা পছন্দ সেটা ভেবে নিন। এদেশের ঠিক কতটা সম্পদ তারা সত্যি সত্যি দখল করে নিয়েছিল : তাদের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ে যাকে, সেই বোরিস বেরেজোভস্কি, যিনি জীবন শুরু করেছিলেন একজন গণিতজ্ঞ হিসেবে আর প্রথম পয়সা করেন গাড়ি বেচে, তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি নিজে ও তাঁর বন্ধু ছজন ধনকুবের, যারা সবাই বড় বড় কনগ্লোমারেটের মালিক, তারা মিলে রাশিয়ার অর্ধেকের মালিক। এটা হয়ত বুক বাজানো।

কিন্তু তাঁর এক সময়ের পার্টনার আর এখন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পোটানিন যখন বলেন যে দশ থেকে পনেরোটা বড় সংস্থা

দেশের অর্ধেক সম্পদের মালিক, সেটা হয়ত সত্যের আরেকটু কাছাকাছি। এর মধ্যে সেই গ্রুপগুলিও আছে যেগুলিতে রাষ্ট্র এখনও নিয়ন্ত্রকের আসনে।[৩]

মাফিয়া ডনদের মতো বদমাস পুঁজিপতি বা ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টরা শাঁসালো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে হস্তগত করবে তা নিয়ে অনেক সময় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। প্রতিযোগিতার কোনো নীতি নিয়ম থাকত না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বেসরকারিকরণ নিয়ে কয়েকটা কথা বলা যেতে পারে। ব্রিটেনে থ্যাচারের আমলে যা হয়েছিল বা আমাদের দেশে এখন যা চলছে, তার সঙ্গে রাশিয়ার ব্যাপার তুলনীয় নয়। মূলত পুঁজিবাদী অনেক দেশে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক সেক্টর থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থেই তা দরকার। ধরা যাক ভারতের কথা। স্বাধীনতার পর এখানে রাষ্ট্র ভারী বা বুনিয়াদি শিল্প গড়তে এগিয়ে এসেছিল। তার প্রধান কারণ নেহরুর সমাজতন্ত্র প্রীতি নয়। আসলে যে ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজন বেশি, আশু লাভের সম্ভাবনা কম, সেখানে বেসরকারি পুঁজি সাবধানে পা ফেলে। অথচ এ জাতীয় শিল্প ছাড়া অর্থনীতি অগ্রসর হতে পারে না। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সাধারণভাবে যাকে ধনতন্ত্র বলা হয়, তা বাতিল করা হয়েছিল। তার জায়গায় কী এসেছিল, সে প্রশ্নে আমরা যাব না। বেসরকারিকরণের মাধ্যমে এই সব দেশে পুঁজিবাদ একেবারে গোড়া থেকে নতুন ভাবে কায়েম হলো।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ''স্বাধীন বাজারের খেলা'' আবিষ্কার করা কঠিন। সে সময়ে পৃথিবীর ঐ অংশে এমন কোনো ধনকুবের ছিল না যে বহুমূল্য ও বিস্তৃত রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি কিনতে পারে, উচিত দামে, এমনকি কম দামেও। ধনকুবের গোষ্ঠী ঐ বেসরকারিকরণেরই ফসল। রাশিয়ায় ''ভাউচার''-এর দিনে ডাকাতি আমরা দেখেছি। পূর্ব জার্মানিতে ''খাঁটি হাত সংস্থা'' নামে সরকারের তৈরি একটি সংগঠন আক্ষরিক অর্থে জলের দরে একটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশের সম্পদ হস্তান্তরিত করেছিল। কারা লাভবান হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। এটা অ্যাডাম স্মিথ বর্ণিত বাজারের অদৃশ্য হাতের কারসাজি নয়। ইয়েল্টসিন ও জার্মান রাষ্ট্রনায়ক কোল-এর অতি দৃশ্যমান হাত। নাগরিকদের মধ্যে সম্পত্তি সমান ভাগে বাটোয়ারা করে ''জনগণের পুঁজিবাদ'' গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও ছিল প্রতারণা। বরং সৃষ্টি হয়েছিল অভূতপূর্ব বৈষম্য, যাকে সুপার রিচ বলা হয় তাদের ও দরিদ্রের মধ্যে মেরুকরণ ঘটে। অনেক শ্রমিক কর্মী নিয়মিতভাবে মজুরি বা পেনশন পর্যন্ত পেতেন না। জেফরি স্যাক্স, রুডিজেন ডমবার্চ ইত্যাদি পশ্চিমা অর্থনাতিবিদ, রুশ ''প্রতিবাদীরা'' এ পথই বেছে নিয়েছিলেন।

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ইয়েল্টসিনের রাজনীতি তাঁর অর্থনীতির মতোই। পার্লামেন্টের বড় অংশের সাথে তাঁর সম্পর্কের ক্রমে অবনতি ঘটছিল। ভাইস প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার রুস্তকয় বরিষ্ঠ সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে পঞ্চাশটি দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন। বেশির ভাগ বেআইনি বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত। প্রসিকিউটারের অফিস অভিযোগের সত্যতা মেনে নিল। ইয়েল্টসিন পাল্টা অভিযোগ আনলেন, রুস্তকয়ের বিরুদ্ধে। রুস্তকয়ের নাকি বিদেশে বেআইনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। পরে দেখা গেল, এই অভিযোগের ভিত্তি জাল দলিল। ১৯৯৩-র আগস্ট মাসে ইয়েল্টসিন ঘোষণা করলেন, ''গরম হেমন্তে''র আবির্ভাব। এলিট সেনাবাহিনীদের নিজের চারপাশে জড়ো করলেন।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে ইয়েল্টসিন বিরক্তিকর সংসদ আর সংবিধান যা তাঁর কাজকর্মকে একটা গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখছে, সেগুলিকে বিসর্জন দেবেন। তা হলেও ২১ সেপ্টেম্বর তাঁর টেলিভিশন বক্তৃতায় তিনি যেসব পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন তা সম্পূর্ণ অবাক করা মতো। সেই বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করলেন যে সুপ্রিম সোভিয়েত ও কংগ্রেস অফ পিপ্‌লস ডেপুটিজ- কে ভেঙে দেওয়া হলো, ডেপুটিরা তারা সংসদীয় সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হলেন, সংবিধানের বেশ কয়েকটি অধ্যায় বাদ দেওয়া হলো, সাংবিধানিক কোর্টের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলো।[৪]

খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে পরবর্তী ঘটনা এই ভাবে বর্ণনা করা যায়। ইয়েল্টসিন কামান, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে, হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে পার্লামেন্ট হাউস দখল করলেন। মেশিনগানের আক্রমণে মস্কো রক্তে ভাসল। তার উপর এই অজুহাতে রুশ কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করলেন। এর আগে, গর্বাচভ আমলের একেবারে শেষ দিকে, সোভিয়েত কম্যুনিস্ট দল নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯৯১-এর আগস্ট মাসে একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল, গর্বাচভ ও ইয়েল্টসিনকে অপসারিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষা করতে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে হাস্যকর ভাবে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছিল। কারা এর পেছনে ছিল, তা আজও স্পষ্ট নয়। তবে ইয়েল্টসিন সব দায় কম্যুনিস্টদের ওপর চাপিয়ে তাদের দলকে বেআইনি ঘোষণা করলেন। পরে অবশ্য পার্টি আবার আইনসিদ্ধ হয়েছিল।

মস্কোর পথে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল, তখন একই ব্যাপার ঘটছিল দক্ষিণ রাশিয়ার চেচেনদের মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রায় শ' তিনেক জাতি বা এথনিক গোষ্ঠী ছিল। সমস্যা যে আগেও ছিল না তা নয়। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে পড়ার পর জাতিগত হানাহানি তীব্র রূপ নেয়। রাশিয়ার নতুন ধনতন্ত্রের এটাও এক বিশেষত্ব।

১৯৯৬ সালে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ইয়েল্টসিন জানতেন, তাঁর জয়ের সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। তিনি পরোক্ষে নির্বাচন আটকাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু

তা সম্ভব হয় নি। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, এক দিকে ইয়েল্টসিন, অন্য দিকে কম্যুনিস্ট নেতা গেমাদি জুগানভ। অন্য প্রার্থীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ''জাতীয়তাবাদী'' সেনানায়ক লেবেদ, খোলাখুলিভাবে ফ্যাসিবাদী ঝিরঝিনস্কি। ইয়েল্টসিনের পক্ষে যত অর্থ খরচ করা হলো, তা প্রায় মার্কিন নির্বাচনের ব্যয়ের সমান। সবটা যে দেশের ভেতর থেকে এসেছিল তাও নয়। মিডিয়ার সিংহভাগ কম্যুনিস্ট বিরোধী প্রচার চালান। টিভি-র রূপালী পর্দায় ভেসে উঠল সোভিয়েত যুগের নেতিবাচক ছবি। শ্রমশিবির, দোকানের সামনে লম্বা লাইন।

> ...আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাইকেল কমডেসাস যেন ক্লিন্টনের প্রার্থনারই উত্তর দিলেন। তিনি মস্কোকে বিরাট একটা ঋণ দিলেন (তিন বছরে ১০২০ কোটি মার্কিন ডলার, প্রথম বছরে দেওয়া হবে ৪০ কোটি ডলার)। এটা অবশ্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বলা চলবে না, যদিও ঋণদাতা জোর দিয়ে বললেন যে রাশিয়া যদি প্রেসিডেন্ট পাল্টানোর মধ্য দিয়ে নীতি পাল্টায়, তবে এই সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। তথাকথিত প্যারিস ক্লাব, যারা বেসরকারি ঋণদানকারীদের বিপরীতে রাষ্ট্রগুলিকে জড়ো করছিল, তারা রাশিয়ার ৪০০০ কোটি ডলারের ঋণ শোধ দেওয়ার বিষয়টি অভূতপূর্ব ভাবে পঁচিশ বছরে বর্ধিত করল।[৫]

সমস্ত জনমত সমীক্ষা কম্যুনিস্ট জয়ের প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। তবু দ্বিতীয় দফায় ইয়েল্টসিন জিতলেন। অনেক বছর পরে দিমিত্রি মেদভদেভ (বর্তমানে দুই নম্বর রুশ নেতা, পুতিনের পরেই) জানালেন, ১৯৯৬-এর নির্বাচনে কম্যুনিস্ট জয় চুরি করা হয়েছিল। অর্থাৎ, ন্যায্য ভোট হলে কম্যুনিস্টরা জিতত। তাদের হারানো হয়েছিল জাল-জুয়াচুরি করে। মনে রাখতে হবে, মেদভদেভ কম্যুনিস্ট বা তাদের মিত্র নন। এ ধরনের কথা বানিয়ে বলার তাঁর কোনো কারণ নেই। আবার ভেতরের কথা জানার সুযোগ তাঁর আছে। এটাও স্মরণীয় যে গর্বাচভ আমলের শেষ দিকে, ১৯৯১-র মার্চে, পনেরটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ন'টিতে গণভোট হয় আর ভোটের সিংহভাগ পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বজায় রাখার পক্ষে।

একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে নির্বাচন, তাতে ইয়েল্টসিনের পক্ষে জয়লাভ একরকম অসম্ভব, জাল জুয়াচুরি করেও, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইয়েল্টসিন এমন এক উত্তরাধিকারী চাইলেন যে আগের জমানার পর্বতপ্রমাণ অপরাধের জন্য কৈফিয়ত চাইবে না। আইনি ব্যবস্থা নেবে না। সেই বাছাই করা মানুষ, ভ্লাদিমির পুতিন। বস্তুত, পুতিন ক্ষমতায় আসার পর ''অলিগার্ক''-রা— রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি দখল করা ধনকুবেররা ঐ নামে পরিচিত— ভয় পেলেন। এবার কি ধর্মের কল বাতাসে নড়বে? লুট করা সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে, অন্তত আংশিক ভাবে? তাই ইয়েল্টসিন উত্তরাধিকারী হিসাবে বেছে নিলেন ভ্লাদিমির পুতিনকে। পুতিন নির্বাচিত হলেন। ''অলিগার্করা'' সামান্য সময়ের জন্য আতঙ্কিত হলেন। নতুন সরকারের সাথে মিটমাট চাইলেন। তাদের মুখপাত্র ইয়াকভলেভ— ইনি সোভিয়েত আমলের এক বড় কম্যুনিস্ট নেতা ছিলেন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙতে অগ্রণী হয়েছিলেন— সুপরামর্শ দিলেন। নতুন সরকার ''অলিগার্কদের'' লুট করা সম্পত্তি আইনসিদ্ধ বলে মেনে নেবে, বিনিময়ে ধনপতিরা কিছুটা বর্ধিত হারে কর দেবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিছুই হলো না। দু-চার জন বাদে কোনো ''অলিগার্কের'' গায়ে আঁচড় লাগল না। খরদভস্কি নামক ধনপতি অবশ্য বছর দশেক কারাবাস করলেন। সম্প্রতি অবশ্য তাঁকে মুক্ত করা হয়েছে। তবে তার আসল কারণ রাজনৈতিক। কেবল অর্থ নিয়ে খুশি হওয়ার বদলে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে পুতিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চেয়েছিলেন।

পুতিনের আমলে রুশ পুঁজিবাদ কী রূপ নিয়েছিল? ইয়েল্টসিন সকালে কফি খাবেন কি চা খাবেন তা ঠিক করার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ফোন করতেন। রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র, ইউগোশ্লাভিয়ার মিলোসেভিচকে যখন ন্যাটো শেষ করে দিয়েছিল, ইয়েল্টসিন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগির মতো চেঁচামেচি ছাড়া কিছুই করেন নি। পুতিন আজ পশ্চিমা রাষ্ট্র ও মিডিয়ার চোখে সাক্ষাৎ শয়তান। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত তিনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সুসম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন। ভিয়েতনাম ও কিউবা থেকে সামরিক ঘাঁটি সরিয়ে নিয়েছিলেন। অন্য দিকে রুশ সীমান্তে মধ্য এশিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনে আপত্তি জানান নি।

> এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে রাশিয়ার সরকার জি ডবলিউ বুশ প্রশাসনকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করছে। আজকের তেলের বেশি দামের যুগে তেল উৎপাদক দেশে রাশিয়া প্রচুর পেট্রো-ডলার পাচ্ছে। ২০০৩ সালের মে মাসে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মজুত অর্থ হয় রেকর্ড পরিমাণ, ৬০০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়, এবং দ্রুত আরো বাড়তে থাকে। কিন্তু এই বিশাল পরিমাণ অর্থ দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করা হয় না বা দেশের নাটকীয় সামাজিক সমস্যার সমাধানে তা ব্যয় করা হয় না। বরং সে সময় মস্কোর সরকার সামাজিক খাতে ব্যয় কমাচ্ছিল এবং সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বাকি বিষয়গুলির উপরও নতুন আঘাত নামাচ্ছিল। অর্থনীতি থেকে সমস্ত বাড়তি অর্থ তুলি নিয়ে একটি স্পেবিলাইজেশন ফান্ডে রাখা হয়, তাত্ত্বিকভাবে এটি তৈরি করা হয়েছিল তেলের দাম কমলে তখন ব্যবহারের জন্য। এর অনেকটাই মার্কিন সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করা ছিল। রাশিয়ার নিজের সমস্যা সমাধানের বদলে মস্কোর সরকার ডলারকে সাহায্য করতে ও মার্কিন অর্থনীতিকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত ছিল।[৬]

বিংশ শতাব্দীর শেষে রুশ অর্থনীতির পতন পুঁজিবাদের বিন্যাসের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এনেছিল। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, তথাকথিত "মস্কো গোষ্ঠী"র স্থান নিয়েছিল তথাকথিত "সেন্ট পিটার্সবুর্গ গোষ্ঠী"।

১৯৯৯-এর বিরাট সংকটের সময় মস্কোর অনেক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়, এমন কি অনেক তেল-সম্রাটেরও প্রচুর লোকসান হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গের ছোটখাট প্রতিদ্বন্দ্বীরা কিন্তু এতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ভয়ানক পশ্চিমাপন্থী একগুচ্ছ বণিক এই 'উত্তরের রাজধানী' থেকে মস্কোয় যান পুতিনের লোক হিসাবে বেসরকারিকরণ হওয়া বড় বড় কোম্পানিগুলিতে ও সরকারের প্রধান প্রধান পদে আসীন হওয়ার জন্য।[৭]

সাধারণ মানুষের অবস্থা অবশ্য উন্নতি হলো না। বরং আগের আমলের জনবিরোধী নীতি আরো জোরদার হলো।

গৃহনির্মাণ ও শিক্ষায় ভরতুকির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আগের চেয়েও কড়া লাইন নিল। সোভিয়েত 'সুরক্ষা জাল'-এর অবশিষ্টাংশ ভেঙ্গে দিতে সচেষ্ট হলো। আবার একই সময়ে তার "গরিবদের জন্য ভাবনা" নিয়ে কথা বলে চললো। ধনীদের আয়কর অনেক কমলো, কারণ দেখানো হলো যে সেটাই নাকি সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে ভালো। নতুন রাশিয়ায় আয়করের হার ছিল সবার জন্য ১৩ শতাংশ। এটা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে কম বলে গর্ব করা হয়। গরিবদের জন্য কিন্তু কর ১ শতাংশ বেড়ে গেল। ২০০১ সালে যে লেবার কোড আনা হলো তাতে ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার সীমিত করা হলো। অলিগার্করা সন্তুষ্টির সঙ্গে এটাকে দেখে আর "দেশপ্রেমিক" বুদ্ধিজীবীরা, যারা ক্রেমলিনে পুতিনের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁরা ক্রমশ হতভম্ব হয়ে যান।[৮]

পুতিনের আমলে রুশ অর্থনীতির উন্নতি হয়েছিল, আপাতদৃষ্টিতে একটা ঝকমকে ভাব এসেছিল, এ কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। ১৯৯৮-৯৯-এর বিরাট পতনের পর অর্থনীতির চক্র আবার কিছুটা উপরের দিকে উঠেছিল। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ক্রমে রাশিয়া হয়ে উঠল BRIC ব্লকের অগ্রগণ্য সদস্য। খনিজ তেলের বিপুল দাম প্রাকৃতিক তেল সম্পদে ধনী রাশিয়ায় উন্নয়ন ও ঐশ্বর্যের চাবিকাঠি নিয়ে এল। এক দক্ষিণপন্থী ব্রিটিশ পত্রিকা মন্তব্য করে, রুশরা এখন যে জীবনের মান উপভোগ করে, যা তাদের সোভিয়েত আমলের পূর্বপুরুষরা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এই স্বচ্ছলতা কতটা বিস্তৃত ছিল?

রাশিয়ায় অবশ্য বেশির ভাগ বাণিজ্য-উদ্যোগীই অপরাধমূলক বা আধা-অপরাধমূলক কাজকর্মে ও বড় মাপের দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল। যে সংস্কার হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থাকার ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছিল। যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ হতে পারত তাদের বেশির ভাগ ভয়ানক খারাপ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল, সামাজিক স্তরবিন্যাসে তাদের অবস্থান দাঁড়িয়েছিল শ্রমিকদেরও নিচে। সংস্কারের বছরগুলিতে শ্রমিকদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়, আর গণতন্ত্র আসার সুফল তারা এখনও কিছু পায়নি।[৯]

অন্যরা অবশ্য এই পর্বে একটি রুশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয়ের কথা বলেন। তাদের শিকড় রুশ মাটিতে নয়, বিদেশে। তারা পশ্চিমে যায় বেড়াতে, বিলাস দ্রব্য কিনতে, এমনকি অর্থ বিনিয়োগ করতে। যাই হোক, এই সুসময়— যদি একে সুসময় বলা যায়— স্থায়ী হলো না। গত দু-এক বছর অর্থনীতির গতি এমনিতেই শ্লথ হয়ে আসছিল। ২০১৪ সালে অনেক কিছু এক সঙ্গে ঘটলো। খনিজ তেলের দাম পড়ল আকাশ থেকে পাতালে। কারণের মধ্যে এখন আমরা যাব না। যে সব দেশে এর দরুণ বিপন্ন হলো রাশিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। রুশ অর্থনীতি তেল রপ্তানির উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। স্টেবিলাইজেশন ফান্ডের কথা আগেই বলা হয়েছে। কথা ছিল, খনিজ তেলের দাম কমলে— অবশ্য এতটা কমবে সেটা কেউ ভাবতে পারে নি— এই ফান্ড সামাল দেবে। বর্তমানে তার অস্তিত্ব দৃশ্যমান নয়। পেট্রো-ডলারের গর্বে পুতিন কিছুটা উড়নচণ্ডী হয়ে উঠেছিলেন, এও স্বীকার্য। যেমন বিপুল ব্যয় করে রাশিয়ার সচিতে "শীতকালীন অলিম্পিক" সংগঠিত হয়েছিল। এর দরুণ আন্তর্জাতিক মহলে রাশিয়ার প্রেস্টিজ বেড়েছিল। হয়ত দেশের অভ্যন্তরে পুতিনের জনপ্রিয়তাও। "অলিগার্করা" দুই হাতে টাকা পেলে দশ হাতে খরচ করেছে, বিশেষ করে বিদেশে। এখন ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। পুতিন অবশ্য দেশবাসীদের আশ্বাস দিয়েছেন, বছর দুয়েকের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। কে জানে!

এ দিকে প্রতিবেশী ইউক্রেনের সঙ্গে গোলমাল বাধল। এই প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে রাশিয়ার অনেক মিল আছে। ধর্মে, ভাষায়, জাতিগত (এথনিক) ভাবে। বিশেষত পূর্ব ইউক্রেনে। পশ্চিম ইউক্রেন পশ্চিমের সাথে একাত্ম হতে, ন্যাটো ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগ দিতে চায়। পূরবীয়ার এ পথ ধরতে নারাজ। কিয়েভে প্রবল বিক্ষোভ মিছিলের পর পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ন্যাটো শক্তিরা, ব্রিটেন, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিষয়টিকে দেখ রাশিয়ার ইউক্রেণ আক্রমণ রূপে। পুতিন ক্রিমিয়া দখল করলেন। ইউক্রেনের এই অঙ্গরাজ্য ১৯৫১ পর্যন্ত রাশিয়ার অংশ ছিল। অনেকের মতে, নতুন শীতল যুদ্ধ শুরু হয়েছে, অবশ্য মতাদর্শের দিক বাদ দিয়ে। এর অর্থনৈতিক ফল, রাশিয়ার ওপর পশ্চিমের নিষেধাজ্ঞা। উত্তরে রাশিয়া পশ্চিম থেকে সব খাদ্যদ্রব্য আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। রুশ পুঁজিবাদ এখন নানা দিক থেকে বিপন্ন। যে লাখখানেক ইউক্রেনিয়ান উদ্বাস্তু যুদ্ধের দরুণ রাশিয়াতে

আশ্রয় নিয়েছে, তাদের খাওয়ানো-পরানোর খরচ, ইউক্রেনের পূরবীয়াদের সামরিক সাহায্য দানের ব্যয় না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল।

সব মিলিয়ে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশে পুনরুজ্জীবিত ধনতন্ত্রের বিশেষত্ব কী? এক হলো চরম অসাম্য। সাবেক আমলের পুঁজিবাদেও বোধ হয় এটা দেখা যায় না। বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনীয় বাস্তব সমাজতন্ত্রের যুগ, তার অন্য যত দোষ থাক না কেন। এক অগ্রগণ্য অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের ভাষায়:

> অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত যে হিসেব আমরা পাচ্ছি তা থেকে দেখা যায় যে রাশিয়া ও পূর্বতন পূর্ব ব্লকের দেশগুলির সম্পদ ২০০০-এর দশকের শেষদিকে ও ২০১০-এর দশকের একেবারে প্রথম দিকে চার বছরের জাতীয় আয়ের সমান ছিল, এবং মোট সরকারি সম্পদ ছিল খুব কম। ঠিক ধনী দেশগুলির মতোই।
>
> ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশক থেকে বার্লিন প্রাচীরের পতন ও কমিউনিস্ট আমলের পতন পর্যন্ত সময়ের হিসেব আরও ত্রুটিযুক্ত, কিন্তু সে সময়ের সমস্ত সূচক বলছে যে তখন এই বণ্টন ছিল এর ঠিক বিপরীত। বেসরকারি সম্পদ ছিল নামমাত্র (যেসব কমিউনিস্ট দেশ ব্যক্তিগত সম্পত্তির সবচেয়ে কম বিরোধী ছিল সেসব দেশে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছোট ছোট জমি আর হয়ত কিছু বাড়িঘর। কিন্তু সব দেশেরই তার পরিমাণ ছিল এক বছরের জাতীয় আয়ের কম।) আর সরকারি পুঁজি ও জাতীয় পুঁজির সিংহভাগ ছিল প্রাথমিক হিসাবমতো তিন থেকে চার বছরের জাতীয় আয়ের সমান। অন্যভাবে বললে, প্রথম দেখায় মনে হয় যে জাতীয় পুঁজির কোনো পরিবর্তন হয় নি কিন্তু সরকারি আর বেসরকারি পুঁজির অনুপাত উল্টে গেছে।
>
> এক কথা বললে, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে ১৯৮০-র দশক থেকে আজ পর্যন্ত বেসরকারি সম্পদের বৃদ্ধি হয়ে চোখ ধাঁধানো, আর সেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তিদের দ্রুত বিশালভাবে ধনী করে তুলেছে (মূলত রাশিয়ার ''অলিগার্ক''-দের কথা ভাবছি)... এটা সম্পূর্ণভাবে পুঁজির মালিকানা সরকারের হাত থেকে ব্যক্তিমালিকদের হাতে যাওয়ার ফল।[১০]

''অলিগার্করা'' দুই হাতে জনগণের সম্পত্তি লুঠ করে, যে সম্পদ গড়ে তোলা হয়েছিল সাত দশকের শ্রম ও রক্ত দিয়ে, তা দশ হাতে খরচ করেছেন। বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের ''ফ্যাশন স্পট'' তাঁদের বিচরণ ক্ষেত্র। ''অলিগার্কদের'' বাজার ফর্দের মধ্যে পড়ে লন্ডন, ভেনিস বা ফরাসি রিভিয়েরার প্রাসাদোপম বাড়ি, বহুমূল্য মণিমুক্তা, গয়না, ছবি, এমনকি ফুটবল ক্লাবের মালিকানা। রুশ ধনকুবেরদের লীলাভূমি বলে লন্ডনের নাম হয়েছে ''লন্ডনগ্রাদ''। আইনের তোয়াক্কা না করে বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অকল্পনীয় অর্থ চালান করেন তারা।

> (সাইপ্রাসের) একটি ফুলে ফেঁপে ওঠা ব্যাংকিং সেক্টর ছিল, প্রচুর পরিমাণ বিদেশি অর্থ, বিশেষ করে রাশিয়া থেকে আসা অর্থের কারণে। এই অর্থ সাইপ্রাসে আসত সেখানে করের হার কম থাকার কারণে ও স্থানীয় প্রশাসনের ব্যক্তিদের কারণে। ত্রিশক্তির (বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ইউরোপিয়ান ব্যাংক) বিবৃতি অনুসারে, রাশিয়া থেকে আসা এই অর্থের মধ্যে ছিল বেশ কয়েকটি বিরাট অংকের অর্থ। অনেকেই তাই মনে করেন যে এই অর্থের আমানতকারীরা অলিগার্ক, যাদের কোটি কোটি, এমনকি বিলিয়ন বিলিয়ন ইউরো অর্থ আছে— পত্রপত্রিকায় যাদের মতো মানুষের কথা লেখা হয়।[১১]

এই বিপুল অর্থ দেশে থাকলে বা দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলে হয়ত রাশিয়ার আজ এ হাল হতো না। কিন্তু নয়া উদারবাদের জমানায় পুঁজি স্বেচ্ছাচারী, স্বেচ্ছা-বিহারী। আমাদের দেশে মোদির সব চেয়ে তাক লাগানো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, তিনি ক্ষমতায় এলে অবিলম্বে বিদেশে পাচার করা কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন। তার থেকে প্রত্যেক ভারতীয়কে ১৫ লক্ষ টাকা দেবেন। বাস্তবে কী হয়েছে তা আমরা জানি।

রুশ পুঁজিবাদের আরো কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়।

> বিশৃঙ্খলা আর ওপর থেকে বজ্রাঘাতের সময় বর্তমান যুগের রাশিয়ার পুঁজিবাদে কয়েকটি বিশেষ দিক দেখা গেল। সম্পত্তির অধিকার ভঙ্গুর ধরনের, মালিকরা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ওপর ভরসা করতে পারে না (বড় বড় মালিকরা তাদের নিজস্ব সুরক্ষা বাহিনী রাখে)। আইনি অধিকার প্রায়ই বিতর্কিত, মালিকদের নিয়ন্ত্রণের কোনও গ্যারান্টি নেই। শ্রমিকরা যেখানে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্প এবং সংস্থার দখল নিয়েছে বা ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, সেখানে মালিকরা বা রাষ্ট্র, কেউই তাদের জোর করে সরাতে পারে নি। যদিও, শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন সংস্থায় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
>
> আর একটা দিক হলো অর্থনীতির অর্থের ভূমিকা বাড়া। ১৯৯৮ সালের শেষে শিল্প সংস্থাগুলির লেনদেনের গড়ে ৫২ শতাংশ হতো মালপত্রে। শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার করণ হলো মজুরি বাকি পড়া। অটো ও ট্রাক শিল্পে ১৯৯৯ সালের মার্চে মজুরি বাকি ছিল ৪.২ মাসের, কৃষি যন্ত্র শিল্পে বাকি ছিল ৭.৪ মাসের। এগুলি আসলে ম্যানেজমেন্টকে দেওয়া বাধ্যতামূলক ঋণ যার সুদের হার ঋণাত্মক। কারণ বাকি মজুরি সূচকের ভিত্তিতে দেওয়া হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দিক হলো এর মানুষখেকো রূপ। ব্যবস্থাটি দেশের জমা সম্পদ খেয়ে ফেলছে।

ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউন্স দেশের জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশের বেশি। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে হিসেব মতো ১৩৬০০ কোটি মার্কিন ডলার রাশিয়ার বাইরে বেরিয়ে গেছে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক ঋণের চেয়ে যার পরিমাণ বেশি। গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে খরচ কমেছে ১৫ গুণ, বিজ্ঞানের কমেছে ৫০ গুণ। অনেক বিজ্ঞানী দেশ ছেড়েছেন বা ছেড়েছেন বিজ্ঞান। সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়াররা প্রথমেই মুমূর্ষু সংস্থাগুলি থেকে নতুন বেসরকারি ক্ষেত্রে চলে আসেন, যেখানে তাঁদের দক্ষতার প্রায় কোনোরকম ব্যবহারই করা হয় না।

শুধু দক্ষতার বিষয়ই নয়, ক্রমশ নিচে নামা জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হ্রাস, মন্দার কারণে মানসিক চাপ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে শ্রমিকবাহিনীকেই ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। জন্মহার ভয়ানক কমেছে, পুরুষদের মৃত্যুহার উনবিংশ শতকের শেষের মতো। একজন প্রখ্যাত জনসংখ্যাবিদের মতে, পরের অর্ধশতাব্দীতে খুব সম্ভবত জনসংখ্যা ৪৫ শতাংশ কমে যাবে।[১২]

সোভিয়েত বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্য সুদীর্ঘ ও গৌরবময়। আজকাল অবশ্য অনেকে লাইসেঙ্কো, সাখারভ, এই রকম দু-চারটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দেখিয়ে তার সবটাই নাকচ করতে সচেষ্ট। উত্তর-সোভিয়েত আমলে এই ঐতিহ্যের পতন আমরা দেখেছি। ''মির'' নামক মহাকাশ স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যদিও চীনের আর্থিক সহযোগিতায় তা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হতো না। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এক রুশ প্রতিনিধি তিক্তভাবে মন্তব্য করেছিলেন, ''রুশ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা বিদেশে চলে যাচ্ছেন, পশ্চিম ইউরোপে বা আমেরিকায়। অন্য দিকে রাশিয়ায় ভিড় করছে অন্য প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র থেকে জাতিগত ও ভাষাগত ভাবে রুশ মানুষরা। কারণ ঐ সব অঞ্চলে আর তাদের স্থান নেই।''

পুনর্জীবিত ধনতন্ত্র যে মতাদর্শের দিক থেকে অতি প্রতিক্রিয়াশীল হবে, তা বলাই বাহুল্য। ফরাসি ঐতিহাসিক তোকভিল বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের আগে ফরাসি অভিজাতরা ছিল প্রায় পুরোপুরি অধার্মিক। কিন্তু বিপ্লবের পর নিজেদের শ্রেণীগত নিরাপত্তা বজায় রাখতে তারা ধর্মের দিকে ঝুঁকল। কারণ ওভাবেই জনগণকে বিভ্রান্ত ও বশীভূত রাখা যাবে। তারপর বুর্জোয়াদের পালা। তারাও বিপদের ইঙ্গিত পাচ্ছিল নবজাত শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে। পুঁজিবাদী রাশিয়া আদর্শ রূপে তুলে ধরল প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার সব চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, জনবিরোধী ধারা বা ঐতিহ্য, জারতন্ত্র ও গ্রিক অর্থোডক্স গির্জা। প্রগতিশীল ধর্ম হয় না তা নয়, কিন্তু রুশ চার্চ মোটেই লিবারেল থিওলজি গোত্রের ছিল না। এক সময় তো মনে করা হয়েছিল, সরাসরি জারতন্ত্র ফিরে আসবে। রোমানভ রাজবংশের এক উত্তরাধিকারী প্রকাশ্যেই আশা প্রকাশ করলেন মস্কোর মসনদে বসার। শেষ পর্যন্ত অতটা হয় নি। কিন্তু অতীতের জারদের গৌরব গাথা গাওয়া এখনও চলছে। শেষ জার নিহত দ্বিতীয় নিকোলাসকে সন্ত ও শহিদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সপরিবারে তাঁর মৃতদেহর অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করে মহা সমারোহে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এটা অবশ্য নিছক প্রতীক। সত্যকারের মৃতদেহ বহুদিন আগে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু প্রতীকের গুরুত্ব কম নয়। তেমনি গির্জাকে রাষ্ট্র ও ''অলিগার্ক''দের তরফ থেকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে। নতুন গির্জা তৈরি হয়েছে। কম্যুনিস্টরা ধর্ম নিষিদ্ধ করেছিল, এ হেন মিথ্যা প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু রুশরা মনের দিক থেকে খুব ধার্মিক হয়েছে, এমন প্রমাণ কম। নতুন বহুমূল্যে তৈরি গির্জাগুলি অনেকটাই ফাঁকা থাকে।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদ প্রত্যাবর্তনের পর কল্যাণকর কিছু দিতে পারে নি। এক ধরনের মাফিয়া ধনতন্ত্র রাজত্ব করছে। অপরাধ, চরম বৈষম্য, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অবনতি ও চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার ভিত্তিতে। রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ, জাতিগত (এথনিক) বিদ্বেষ ও হানাহানি শেষ করে দিয়েছে সাত দশকের মানবিক প্রয়াসকে। ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকারে ডুববে না কখনো আলোকিত হবে, তা বলা কঠিন।

তথ্যসূত্র

1. Abel Agarbegyan, *The Challange : Economics of Perestroika*, Huchinsons, London, 1988
2. Aijaz Ahmad, *In Theory : Classes, Nations, Literatures,* Oxford University Press, 1992, pp. 323-24
3. Daniel Singer, *Whose Millenium? Theirs or Ours?* Monthly Review Press, 1999, pp.37-39
4. Alexander Buzgalin and Andrei Kalganov, *Bloody October in Moscow : Political Repression in the Name of Reform*, Monthly Review Press, 1994, p. 34
5. Whose Millenium? p.81
6. Boris Kagarlitsky, 'The Russian State in the Age of Amercan Empire', *Socialist Register, 2005, The EmpireReloaded*, Merlin Press, London, p. 285-86
7. *Ibid*, p. 290
8. *Ibid*, p 291
9. *Bloody October in Moscow*, p. 206
10. Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Harvard University Press, 2014, pp. 186-87
11. *Ibid*, pp. 554
12. David Mandel, 'Why There is No Revolt?', *Socials Register, 2001*, Merlin Press, London, pp. 196-97

প্রবন্ধ

শিক্ষা সংহার— এই আমাদের দেশ

সমরেশ মিত্র

১৯৪৭-এর সেই মধ্যরাত্রে যখন ভবিতব্যের সন্ধানে আমাদের দেশের নেতারা যাত্রা শুরু করলেন, তখন তাঁদের প্রতিশ্রুতির তালিকার একেবারে গোড়ার দিকে ছিলো সর্বজনীন শিক্ষা প্রসার সহ শিক্ষা সংক্রান্ত নানান পদক্ষেপের কথা।

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে ভারতের যোজনা কমিশন হলো মার্কিন সেনেট-এর 'উপাঙ্গ'— অর্থাৎ অতঃপর ভারতের বিকাশের পরিকল্পনার দিশা এবং রূপায়ণ ঘটবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মার্কিন তত্ত্বাবধানে। বস্তুত কৃষি এবং শিক্ষা— এই দুই ক্ষেত্রে মার্কিন হস্তক্ষেপ একেবারে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়।

১৯৫১ থেকে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি এবং আইন করে নানান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে নেহরু ভারতের কৃষিক্ষেত্রে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতীয় কৃষি এবং কৃষি সংক্রান্ত পঠন-পাঠন ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হন। মার্কিন বিশেষজ্ঞ পার্কার সাহেব এবং লাদেজিনস্কি সাহেবের নিদান মতে ভারতকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে সেই সব অঞ্চলের ''কৃষি— ''আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ'' কৃষিকাজ সংগঠিত করার ''মহান লক্ষ্যে'' বেশ কয়েকটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে এই কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রণীত আইনের মুখবন্ধ মতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক বিদ্যা ও বিজ্ঞান পঠনের পাশাপাশি এমন শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকবে যাতে পশ্চিমবঙ্গের পল্লী ও অন্যান্য অঞ্চলের কল্যাণ সাধিত হয়। তারপর এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার আন্দোলন হয়। এই বিচ্ছিন্নকরণের পক্ষে মূল যুক্তি ছিলো দুটি— এক) এর ফলে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থানের অনুদান সরাসরি জুটবে, সঙ্গে জুটবে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সরাসরি হস্তক্ষেপ, কেননা তখন ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার অর্থের মুখ্য জোগানদার ছিলো মার্কিন দেশ, এবং অনুদানের শর্ত ছিলো মার্কিন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পঠন-পাঠন-পাঠক্রম, কৃষি প্রকৌশল এবং কৃষি-গবেষণার দিশা নির্দিষ্ট করা। দ্বিতীয় যুক্তিটি ছিলো আরও ভয়াবহ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবে নাকি আমাদের দেশের কৃষি সমস্যা ও পাশাপাশি খাদ্য সমস্যার সমাধানের বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বলা বাহুল্য, এই দুটি যুক্তিই প্রথমে পার্কার সাহেব এবং পরে লাজেজিনস্কি সাহেব আমদানি করেন ''সবুজ বিপ্লব''-এর বীজ ভারতে বপনের উদ্দেশ্যে। অন্য একটি বিষয়ও তখন (ঠিক যেমন আজকেও) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— সারা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে উত্তাল কৃষক আন্দোলন। কৃষক আন্দোলন স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় যে কৃষি এবং খাদ্য সমস্যার সমাধান শুধু প্রযুক্তির প্রয়োগে বা পণ্ডিতদের বুদ্ধিচর্চার দ্বারা সম্ভব নয়— এর জন্য প্রয়োজন বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার কর্মসূচি— কৃষকের হাতে জমি থাকার নিশ্চয়তা প্রদান। মার্কিন নিদান মেনে ভারত সরকার সহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি একদিকে কৃষক-বিক্ষোভ সামাল দিতে পীড়ন-মূলক ব্যবস্থা আমদানি করে, অন্যদিকে কৃষি পরিকল্পনা থেকে কৃষককে হটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত কৃষি-পঠনের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষিকে পার্কার-লাজেদিনস্কি ফর্মুলা অনুসারে সাজিয়ে নেওয়ার আয়োজন করে।

প্রায় একই রাস্তা নেওয়া হয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছি, কেননা যে সময়কার ইতিহাস চর্চা থেকে আমরা বর্তমানকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো, সেই সময়ে এই রাজ্যে সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় (এবং সুপ্রাচীন) ছিলো এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই।

''সিপাহি বিদ্রোহ''-এর অভিঘাতে কম্পমান ভারতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঘাতসহ একটি শ্রেণী স্থাপনের উদ্দেশ্যে মেকলে সাহেব তাঁর বিখ্যাত ''মিনিট্স''-এর মাধ্যমে ভারতে ''শিক্ষা বিস্তার''-এর পরিকল্পনা হাজির করেন। ইংরাজ বণিক শ্রেণীর ব্যবসায়িক স্বার্থ-রক্ষার তাগিদেই যে এই পদক্ষেপ এবং সদ্য-সমাপ্ত বিদ্রোহ যে এই স্বার্থকে আঘাত করেছিলো, তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় যখন আমরা দেখি ব্রিটিশ সরকার তাদের ''শিক্ষা বিস্তার''-এর জন্য বেছে নেয় তিনটি বন্দর নগর— কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বম্বে!

এই পরিকাঠামো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার পর আমাদের ভবিতব্য সংযুক্ত হয় মার্কিন দেশের সঙ্গে। ১৯৫১-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রথম সংশোধিত হয় এবং তা দীর্ঘ দিন চালু থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধিকার বনাম অধীনতা, এই বিতর্কের ছায়া ছিলো ১৯৫১-র আইনে। সরকার বা সরকারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহির্স্থ শক্তির নিয়ন্ত্রণ খুব সহজ ছিল না। অথচ মার্কিন দেশের নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন ভারতের পুরো শিক্ষা ক্ষেত্রটি নিয়ন্ত্রণ ক'রে তার পণ্যায়ন করা। অতএব প্রয়োজন পড়ল আইন সংশোধনের। অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষাবিদরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকে আরও গণতান্ত্রিক করার জন্য মুখর ছিলেন, উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম দাবিও ছিলো এই শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ।

একটু পেছিয়ে গিয়ে আমরা ১৯৬৪ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের বিষয়টি আলোচনা করব এই কারণে যে তা আমাদের বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হবে। ২৪.১১.১৯৬৪ *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকায় এই আইন প্রণয়নে মার্কিন দেশের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিষয়টি ফাঁস হয়ে

যায়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ''ফোর্ড ফাউন্ডেশনের একটি বিশেষজ্ঞ দল বর্তমান আইনটির রচনা সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করার পর যে সুপারিশগুলি করেন, তার ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান উপাচার্য মহাশয় বর্তমান আইনের খসড়া রচনা করেন।'' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জী ৪.৪.১৯৬৪ সেনেটের সভায় তৎকালীন উপাচার্য শ্রী বিধুভূষণ মালিক মহাশয়কে বলেন, ''আপনি সিন্ডিকেটের সভায় বলেছিলেন যে, ফোর্ড ফাউন্ডেশন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে এক কোটি ডলার দিতে চেয়েছে এই শর্তে যে তাদের সুবিধে মতো বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনটি পরিবর্তিত হবে।''

ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সরাসরি আর্থিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা। ১৯৬৪-র বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সেই ব্যবস্থা পাকা করা হয়। আর্থিক নিয়ন্ত্রণের সাফাই গাইতে তৎকালীন উপাচার্য ৩০.৩.১৯৬৪ সেনেট-এর সভায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দিকটা যতটা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হওয়া উচিত ততটা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে না বলে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট-এ জোর সুপারিশ করা হয়েছে যে অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য একজন প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর থাকা উচিত। তেমনি সুদক্ষ প্রশাসনের জন্য স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগে একজন করে প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর থাকা উচিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মহাশয়, শ্রী বিধু ভূষণ মালিক যেদিন সেনেট সদস্যদের সামনে ১৯৬৪-র আইন-এর খসড়া পেশ করছিলেন তখন দেখা গেলো সেনেট সদস্যদের হাতে হাতে আগে থেকেই বিতরিত একটি প্রচারপত্র শোভা পাচ্ছে। প্রচারপত্রটির শিরোনাম, ''Three Conditions That Must Be Fulfilled'', প্রচারক ভারতের ফোর্ড ফাউন্ডেশন। প্রথম শর্তটিই ছিলো সেনেটের যতটুকু গণতান্ত্রিক কাঠামো তা ধ্বংস করে মনোনীত প্রতিনিধিদের মারফত বিশ্ববিদ্যালয় চালানো। দ্বিতীয়টি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার খর্ব করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি সরকারি নিয়ন্ত্রাধীন প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করা। তৃতীয়টি ছিল সহ-উপাচার্য নিয়োগ।

দুটি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা এই আইন নিয়ে বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেননি। তারপর সিদ্ধার্থ রায় সরকার মনোনীত প্রতিনিধি মারফত বিশ্ববিদ্যালয়কে তামাশার সংগঠনে পর্যবসিত করে।

বিখ্যাত কবি শ্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে ''রাজা আসে যায় / নীল জামা গায় লাল জামা গায়.../ দিন বদলায় না।'' কে জানত, শিক্ষাক্ষেত্রে এই কথাটা এমন মর্মান্তিক সত্য হিসেবে উপস্থিত হবে! লাল জামা গায়ের মুরুব্বিরা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে, বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিকীকরণের নামে চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবন এবং ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার ওপর তাঁদের বহু-বিজ্ঞাপিত ''গণতান্ত্রিক'' আইনটি প্রতিষ্ঠা করলেন। এসবের পিছনে কারণটাও খুব অদৃশ্য নয়।

মার্কিন দেশ এক সময় ফোর্ড ফাউন্ডেশন ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বদলে আরও প্রত্যক্ষ, আরও দৃঢ় হস্তক্ষেপের জন্য বহুপাক্ষিক সমঝোতার উদ্দেশ্যে গ্যাটস নির্মাণ করে এবং ভারতের সংসদকে এড়িয়ে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ভারতকে বহুভোগ্যা করে দেন। সাধারণ পণ্য-র জন্য বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমঝোতায় পৌঁছেও যখন দেখা গেল পশ্চিমী ধনতন্ত্র মুনাফার হার কমে এলো, তখন প্রয়োজন পড়লো মুনাফার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করা।

এই লক্ষ্যে নির্মিত হলো পরিষেবা সংক্রান্ত পণ্যের বিষয়ে সাধারণ সমঝোতা— যে চুক্তির আদ্য অক্ষরগুলি বলা হয় গাট্স বা জিএটিএস। এই সমঝোতা অনুসারে শিক্ষা হলো পণ্য। যুক্তিটা খুবই সরল। গাট্স চুক্তির রচয়িতাদের মতে, পড়ুয়ারা হলো শিক্ষা পরিষেবার ভোক্তা, শিক্ষকরা হলেন পরিষেবা দাতার সহায়ক, শিক্ষা সংস্থাগুলি পরিষেবা বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটি এখন আর জাতিগঠনের হাতিয়ার নয়, বরং মুনাফার জন্য একটি ব্যবসায়িক পণ্য! তাই সরকার এবং পড়ুয়াদের অভিভাবকদের মাথায় যদি কোনওভাবে এই কথাটা ঢোকানো যায় যে শিক্ষায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভরতুকি একটি ভয়ানক নীতি-বিগর্হিত বিষয় তবে শিক্ষা নামক পণ্যের দাম কাঞ্চনমূল্যে মেটাতে হবে, আর সেই শিক্ষাপণ্যের অনুমিত বাজার হলো তিন ট্রিলিয়ন ডলার!

শিক্ষার পণ্যায়ণের এই ধারণা নয়া উদারনীতিবাদেরই রকমফের— অতএব এতে ভারত সরকারের কোনও আপত্তি ছিল না। দুর্ভাগ্য এই যে, যে বামপন্থীরা বিশ্বায়নের বিরোধিতা না করে অন্ন-জল গ্রহণ করতেন না, তারাও বলতে শুরু করলেন যে কোনো ''বিনা পয়সার ভোজ'' (পড়ুন শিক্ষায় প্রয়োজনীয় ভর্তুকি) অপরাধ! যে যে রাজ্যে তাঁরা ক্ষমতায় আসীন ছিলেন (যেমন পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা বা ত্রিপুরা) সেখানে চললো মুখে গ্যাট বিরোধিতা এবং কাজে গাট্স রূপায়ণ।

কেন্দ্রের দুটি ইউপিএ সরকার এবং দুটি এনডিএ সরকার একই রকম দ্রুততায়, একই রকম প্রক্রিয়া গ্রহণ করে পরিষেবা সংক্রান্ত সমঝোতা রূপায়ণে জোর কদমে এগিয়ে চলে। অতীতে ফোর্ড ফাউন্ডেশন যেমন ''তিনটি শর্ত'' প্রয়োগ করেছিল, গাট্স তাকে আরও প্রসারিত করে যুক্ত করে মাইনে বৃদ্ধি, স্বাধিকার হরণ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মঞ্জুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য ছাড় এবং উচ্চশিক্ষায় বিপুল আকারে বেসরকারিকরণ।

১৯৪৭-এর আগেই নেহরুর পছন্দের অর্থনৈতিক মডেল ছিল ভারতের বড় পুঁজির মালিকদের মুনাফা করার মডেল। তাই টাটা-বিড়লা দ্বারা প্রস্তুত এবং প্রস্তাবিত পরিকল্পনা (বম্বে পরিকল্পনা) গ্রহণের উদ্যোগ চলে। এরপর ভারতীয় অর্থনীতিতে

প্রথমে মার্কিন দেশ, পরবর্তী স্তরে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ইত্যাদির আগ্রাসী অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত হয়।

নেহরু ঘরানায় ভারতে যে কোনও পরিকল্পনা করার সময় প্রথমেই ডাক পড়তো মার্কিন বিশেষজ্ঞদের এবং টাটা-বিড়লার। তাদের প্রস্তাবিত এবং পরিকল্পিত রিপোর্টের ভিত্তি করে ভারতের পরিকল্পনার দলিল রচিত হতো। এই পরম্পরার কোন পরিবর্তন আজও ঘটেনি— তা সে নেহরু-পরিবার ভিত্তিক ইউপিএ সরকারই হোক বা নেহরু-নীতির কট্টর বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে এনডিএ সরকারই হোক। এনডিএ সরকারের মানবসম্পদ মন্ত্রী শ্রী মুরলী মনোহর যোশী ১৯৯৮ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন হায়ার এডুকেশন-এ ভারতের হয়ে যে দলিলটি পেশ করেন, তাতে বলা হয়, ‘‘অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের সুপারিশ হলো উচ্চশিক্ষার সংস্থাগুলি ছাত্রদের মাইনে বাড়িয়ে, বেসরকারি অনুদান জোগাড় করে, পরামর্শ প্রদান করে টাকা রোজগার করে সেই বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করবে।’’ আশ্চর্যের কথা হলো, এনডিএ সরকারের পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকার নিযুক্ত *ক্যাবে* কমিটি, *ন্যাশনাল নলেজ কমিশন* এবং যশপাল কমিটির সুপারিশও ছিলো এগুলোই। আর হ্যাঁ, ভারতে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু করার জন্য *আইএমএফ* নিযুক্ত কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছিল, যার ভিত্তিতে রাজীব গান্ধী এবং পরবর্তী কালে নরসিমা রাও সরকার শিক্ষায় বেসরকারিকরণের প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করেছিলেন, তার প্রথম সুপারিশটিই মুরলী মনোহর যোশী সগর্বে প্যারিস কনফারেন্স-এ পড়ে দেন!

নেহরুর জন্য যেমন টাটা-বিড়লা তাঁদের বোম্বে পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, বিজেপির জন্য তেমনি হাজির হন মুকেশ আম্বানি এবং কুমার মঙ্গলম বিড়লা। গাট্‌স সমঝোতায় ভারত স্বাক্ষর দেওয়ামাত্র দেশের এবং দেশের বাইরের শিক্ষাপণ্যের বাজারটি বিদেশি সহায়তায় কব্জা করতে এই দুই শিল্পপতি এনডিএ সরকারের কাছে ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই গালভরা রিপোর্টটির নাম হলো ‘‘আ পলিশি ফ্রেমওয়ার্ক ফর রিফর্মস ইন এডুকেশন’’। রিপোর্টটির মূল কথা হলো : ১) ভারতের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে শিক্ষা-পণ্যর বাজারে পরিণত করতে হবে; ২) শিক্ষা-পণ্য বিপণনের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য হবে মুনাফা করা; ৩) যেহেতু শিক্ষা ক্ষেত্রটি একটি মুনাফার ক্ষেত্র, অতএব এই ক্ষেত্রটিতে সম্পূর্ণ বেসরকারি লগ্নির প্রাধান্য থাকাই যুক্তিযুক্ত; ৪) সরকার এমন নীতি/আইন প্রণয়ন করুক যা প্রথম তিনটি বিষয় নিশ্চিত করবে। এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বিক্ষোভ অবধারিত, অতএব সর্বপ্রথম সরকারকে যে আইনটি তৈরি করতে হবে সেটি হলো ‘‘শিক্ষাসংস্থায় রাজনীতি করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার সাংবিধানিক অধিকারের বিলোপ আইন’’। কথাগুলি যদি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি বলে মনে হয় তো আমরা নাচার!

আমরা দেখেছি এনডিএ-ইউপিএ এবং বর্তমান নরেন্দ্র মোদী সরকার সত্যি সত্যিই এই সমস্ত বিষয়গুলি নিশ্চিত করার জন্য একটার পর একটা বিল এনেছে এবং সেগুলি পাশ হওয়ার পথে বিভিন্ন অবস্থায় বর্তমানে বিরাজ করছে। গাট্‌স চুক্তি রূপায়ণের দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে নরেন্দ্র মোদী সরকার বর্তমান বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কমিয়েছে। পুরো আর্থিক বরাদ্দর ভিত্তিতে দেখলে বিদ্যালয় শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমেছে ১৩ হাজার কোটি টাকা আর উচ্চশিক্ষায় কমেছে ৮০০ কোটি টাকা। এমন কি ‘‘শিক্ষা বিস্তার’’ নিয়ে ভারত সরকারের বহুল বিজ্ঞাপিত প্রকল্প, সর্বশিক্ষা অভিযান-এ বরাদ্দ কমেছে ৬০০০ কোটি টাকা। পাশাপাশি আইআইটি, আইআইএম বা এইম্‌স-এর মতো প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ঘোষণা হয়েছে, যেগুলিকে পড়ার খরচ বেশি এবং যেগুলি থেকে পাশ করা ছাত্ররা সরাসরি বিদেশে পাড়ি দেয়।

এবার আমরা আমাদের এই রাজ্যের দিকে, এই রাজ্যের ‘‘পরিবর্তনপন্থী’’ সরকারের কাজকর্মের দিকে নজর ফেরাই। ২০১১-তে বহু মানুষ যখন এই দলটির প্রতি হাত বাড়িয়ে ধরেছিলেন, তখন তাঁদের যুক্তি ছিল খানিকটা এই রকম : এই দলটি যেহেতু ‘‘দলতন্ত্র’’ এবং ‘‘স্বৈরতন্ত্র’’-র বিরোধিতা করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে, তাই এই দলটি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছুদিনের জন্য দলতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র এবং বিশ্বায়নের আগ্রাসী রূপায়ণ ঘটবে না। জনগণ কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধারণার সারবত্তা নিয়ে আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। তার আগে বলে নিই যে বিশ্বায়নের মূল ধারণাগুলি রূপায়ণে বর্তমানের ‘‘পরিবর্তনকামী’’ সরকারের অনীহা বা প্রত্যক্ষ বিরোধিতার কোনও নজির এখনও চোখে পড়েনি। বরং আমরা দেখেছি শিল্পমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন যে ইনফোসিসকে *সেজ* করতে না দিলেও *সেজ*-এর সমতুল্য সুবিধা দিতে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতেও এই সরকার দ্বিধা দেখায়নি। স্থায়ী চাকরির পরিবর্তে অস্থায়ী চাকরি, স্থায়ী শিক্ষকের পদে কম মাইনেতে অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের আম্বানী-কুমারমঙ্গলম কমিটির সুপারিশ রূপায়িত করতেও এই সরকারের দ্বিধা নেই।

আমরা আবার ফিরে যাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৪-র আইন সংশোধনের সময় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কাহিনীতে। ফোর্ড ফাউন্ডেশন চেয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করে শিক্ষা সংস্থাটিকে প্রত্যক্ষ সরকারি নিয়ন্ত্রাধীন করতে, যার ফলে ফোর্ড ফাউন্ডেশন বা বকলমে মার্কিন দেশ রাজ্য সরকার মারফত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রণ করবে। বর্তমান তৃণমূল সরকার আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই এই রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন অর্ডিনান্স করে ভেঙ্গে দিয়েছে

এবং মনোনীত সদস্য দিয়ে, কোনও নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রশাসন চালাচ্ছে। উপাচার্য নিয়োগে স্বচ্ছতা নেই— স্বচ্ছতা নেই শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়োগ পদ্ধতিরও। অস্থায়ী উপাচার্যদের মারফত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার বিষয়টি পাকা করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন স্থগিদ করে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের, শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে— ঠিক যেমনটি ছিল আম্বানি-বিড়লাদের সুপারিশে। কল্যাণী বিশ্ববি্যদালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, যেমন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনটিকে। আচার্য নিয়োগ করেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববি্যদালয়ের উপাচার্যকে, তাঁকে বরখাস্ত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী! পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নানান কাজের 'অসঙ্গতি'-র বিরুদ্ধে তদন্তের ভার পড়লো অনেক নিম্নপদের অধিকারী ব্যক্তিদের ওপর!

সম্প্রতি সরকার চাইছে সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন শাসন বিধি, অনেকটা সরকারি প্রশাসন পরিচালনার জন্য সেই ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা প্রশাসনিক ম্যানুয়েল-এর আদলে। তারপর স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে এবং তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হতে চলেছে সরকারি কর্মচারীদের জন্য চালু মাইনে ব্যবস্থা বা 'কোসা'। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্র এখনই বিষময় হয়ে উঠেছে। যেমন কল্যাণী কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মাইনে দেওয়ার জন্য 'ড্রয়িং এ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার', অর্থাৎ যার তত্ত্বাবধানে সরাসরি কোষাগার থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় চাকুরিরত ব্যক্তি মাইনে পাবেন, তিনি হলেন মহকুমা শাসক— বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ নন। ফলে এই শিক্ষা সংস্থা, যেটি স্বশাসিত, তার কর্মচারীরা একজন সরকারি কর্মচারীর দাক্ষিণ্যে মাসের যে কোনও সময়ে মাস মাইনে পান। এই ব্যবস্থা অবিলম্বে সমগ্র রাজ্য জুড়ে হতে চলেছে। এবং এইসব কুকীর্তির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর (অর্থ) ওকালতি করছেন। মনে রাখা দরকার এই পদটির সৃষ্টি হয়েছিল ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সুপারিশ মোতাবেক। বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষকদের বেতনের প্রাপ্য থেকে বাড়ি ভাড়া মেরে দেওয়া চালু হয়েছে। তাই সম্পূর্ণ সংবিধান-বহির্ভূতভাবে স্কুল শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারী বলে ঘোষণা করে তাঁদের প্রাপ্য বাড়িভাড়া থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। একই ঘটনা ঘটছে কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও। এই বিষয়ে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করলেও সেই বাড়ি ভাড়ার টাকা কেটে নেওয়ার ট্রাডিশন সমানে বহমান। তথাকথিত 'পে-প্যাকেট' পাঠানোর যে প্রহসন এবং 'কোসা' পদ্ধতি (যা কিনা সরকারি কর্মচারীদের জন্য নির্মিত) অনুসরণ করে প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর টাকা কাটার নাম করে যে অনাচার কলেজে কলেজে গত সাত-আট মাস চলছে, তার নীট ফল হলো বহু কলেজের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ তাঁদের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর তিন মাসের সুদ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন, কেননা 'কোসা' পদ্ধতি মানলে তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর টাকা যথাযথ স্থানে যথা সময়ে পৌছচ্ছে না, পৌছবে না।

এক কথায় বলা যায় বর্তমান সরকার প্রথমে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বশাসিত সংস্থাগুলির প্রশাসনিক স্বাধিকার হরণ করেছে *গাটস* এবং আম্বানি-বিড়লার সুপারিশ মোতাবেক— অর্থাৎ তাঁরা শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারত সরকারের চলমান নয়া-উদারনীতিই রূপায়ণ করেছে, মুখে তারা যাই বলুক না কেন। দ্বিতীয় ধাপ হিসাবে তারা এই সমস্ত সংস্থার আর্থিক স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে, যাতে তারা তৃতীয় ধাপ অর্থাৎ সরকারি সম্পত্তির বেসরকারিকরণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা কর্‌তে উদ্যেগী হয়েছে। তারা পশ্চিমবঙ্গে গন্ডা দুয়েক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন দিয়েছে, পৌরসভার স্কুলগুলিকে বেসরকারি মালিকানায় দেওভার প্রস্তাব বিবেচনা করছে, প্রতিটি শিক্ষা পর্যদের মাথায় বসিয়েছে প্রশাসক। এখন চাইছে অভিন্ন কর্মী নিয়োগ কমিশন— যাতে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি এই নৈরাজ্যের আবাহন আসলে স্বশাসিত পাবলিক সংস্থাগুলির প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করার ষড়যন্ত্র। যাতে মানুষ সরকারি স্কুলের পরিবর্তে বেসরকারি মহার্ঘ স্কুলগুলির দ্বারস্থ হয়, যাতে সরকারি কলেজের পরিবর্তে বেসরকারি, কর্পোরেট পরিচালিত কলেজে বিপুল মাইনের বিনিময়ে ঢুকতে বাধ্য হয়, যাতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চমৎকার পরিকাঠামো জলের দরে বিড়লা-আম্বানীদের বেচে দেওয়া যায়, তার আয়োজন করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের পিপিপি মডেল এটাই।

এই পরিপূর্ণ মাৎস্যন্যায়ের মধ্যেও যাদবপুরের লড়াকু ছাত্ররা আন্দোলন করে আত্মমর্যাদার প্রশ্নে জয়ী হয়েছেন। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত হয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ নিরন্তর লড়াই-এ রত। কামদুনির মৃতা এবং ধর্ষিতা ছাত্রী, সুতিয়ার নিহত স্কুল শিক্ষক, সরকারি অবহেলায় আইন-অমান্যকারী মৃত ছাত্র নেতা হাওলার টাকায় চলা এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত ছোটো ছোটো প্রতিরোধের ব্যারিকেড তুলছেন, আক্রান্ত হচ্ছেন, পরাজিত হচ্ছেন, কিন্তু শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়াতে সাহসী হচ্ছেন। যে সংগঠিত শক্তির এই প্রতিরোধগুলিকে সংহত করার দায় ও দায়িত্ব ছিল, তাঁরা আক্রান্ত হয়ে আপাতত হয় অবসৃত নয় পাহাড়ে-জঙ্গলে আত্মগোপনে। রণক্ষেত্রে এখন মুখোমুখি দুটি দল। দেখার বিষয় যে পুঁজির বিশ্বায়নকে শ্রমের আন্তর্জাতিকতা স্তব্ধ করতে পারে কিনা, পারে কিনা বিজয়কে ছিনিয়ে আনতে।

স্মরণ

কমরেড অসিত সিনহা

নিমাই ঘোষ

৩১শে জানুয়ারি ২০১৫ কমরেড অসিত সিনহা এনআরএস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। প্রায় নিঃশব্দে তাঁর এই চলে যাওয়া। আজীবন আত্মত্যাগী মানুষটা প্রচার-বিমুখ, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেভাবে বিপ্লবের স্বার্থে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার আলোকে মুক্ত ভারতবর্ষ, শোষণহীন ভারতবর্ষ গড়ার সংগ্রামে, নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন, তা একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট হিসাবে তাঁর অবদান।

ছাত্রাবস্থা থেকে যে আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হন, সেখান থেকে তিনি শেষদিন পর্যন্ত পিছু হটেন নি।

১৯৯৫ সালে বিহারের একটি সভায় সেরিব্রালে আক্রান্ত হন। সেদিন কমরেড কানু সান্যাল তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। তাঁর একদিকে পক্ষাঘাত হয়ে যায়। তখন থেকেই শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যান। কিন্তু ঐ অবস্থায়ও সক্রিয় মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঘুরে বেড়ান।

১৯৩৯ সালে ঢাকায় জন্ম। বাবা নলিনী মোহন সিনহা, মাতা আশালতা সিনহার চতুর্থ সন্তান ছিলেন। পাঁচ ভাই, তিন বোন। ১৯৪৮ সালে বাবা মার সঙ্গে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় বর্ধমান জেলার কুলটিতে চলে আসেন। পড়াশুনা শুরু হয় কুলটিতেই। ১৯৫৮ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। তারপর কলকাতায় এসে গুরুদাস কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬২ সালে আইএ, ১৯৬৫ সালে বিএ পাশ করেন। এরপর ল-কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তখন তিনি ছাত্র আন্দোলনে এতটাই সক্রিয় যে আইন পরীক্ষা দেওয়া হয় না। গুরুদাস কলেজে একজন প্রধান সংগঠক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরবর্তীকালে সিপিআই পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত পার্থক্যের প্রেক্ষিতে যে রাজনৈতিক বিভাজন হয় তাতে সিপিআই(এম)-এর সাথে যুক্ত হন। সেই সময়ে তাঁর সহযোগী ও পরবর্তী প্রজন্মের কমরেডরা তাঁকে বিশেষভাবে মনে রাখবে ছাত্র আন্দোলনের এক সক্রিয় সংগঠক ও অগ্রণী নেতা হিসেবে। বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের পর্যায়ে 'ছাত্রছাত্রী' প্রকাশিত হলে ছাত্র সংগঠনের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক দেখা দেয়। 'ছাত্রছাত্রী' পত্রিকাটি নির্মল ব্রহ্মচারী, অসিত সিনহা, শৈবাল প্রমুখদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে অসিত, নির্মল, আজিজুল প্রমুখরা কারারুদ্ধ হয়। সেই সময় 'ছাত্রফৌজ' প্রকাশিত হয় শৈবাল মিত্রের সম্পাদনায়। ১৯৬৬ সালের খাদ্য-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে হেডলাইন হয়, "মানুষ কেন কেড়ে খায়"। এই শিরোনাম থাকায় ছাত্রফ্রন্ট ও পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে এবং ঐসব ছাত্রদের ওপর পার্টির চাপ বাড়তে থাকে। পরে অসিত, আজিজুল, নির্মলরা মুক্তি পেলে কম. নির্মল ব্রহ্মচারী 'ছাত্রফৌজ'-এর সম্পাদক হয়। সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকেন অসিত সিনহা, শৈবাল মিত্র, প্রদ্যুৎ রায়, বীরেশ ভট্টাচার্য, দিলীপ পাইন, আজিজুল হক প্রমুখরা দায়িত্বে থাকেন। পরবর্তীকালে অসিত সিনহা নকশালবাড়ি কৃষক সহায়ক সমিতি ও পরে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাথে নিজেকে যুক্ত করেন।

১৯৬৯ সালে ১লা মে শহীদ মিনারে যে সভা হয় যাতে কম. কানু সান্যাল সিপিআই(এম এল) পার্টির নাম ঘোষণা করেন, তাতে কম. অসিত সিনহার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কমরেড অসিত সিনহার রাজনৈতিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য সময় কেটেছে কারারুদ্ধ অবস্থায়। '৬৫, '৬৭, '৬৮ ও '৭০ সাল থেকে টানা '৭৭ সাল পর্যন্ত বন্দি ছিলেন। এই সময় জেলে রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে কম. কানু সান্যালের খুব কাছাকাছি আসেন। কম. কানু সান্যালের 'More about Naxalbari' লেখা নিয়ে যে বিতর্ক হয় তাতে অসিত সিনহা সেই বিতর্কে কম. কানু সান্যালের পক্ষে সোচ্চার হন।

১৯৭০ সালে পিতৃবিয়োগ হলে তিনি শিয়ালদহ অঞ্চলে ঐ অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। এর কিছুদিন পরেই 'দেশব্রতী' পত্রিকা ও প্রেসের উপর হামলা হয়। পুলিশ 'দেশব্রতী'-র প্রেসকর্মী ও পার্টি কমরেডদের সাথে তাঁকেও একটা মিথ্যা হত্যা মামলায় যুক্ত করে মেদিনীপুর জেলে পাঠায়। তারপর '৭১ সালে ৫ম ট্রাইবুনালে যুক্ত করে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে আনা হয়। দীর্ঘ কারাবাসের পর '৭৭ সালে তিনি মুক্ত হন। ভাইজাক জেলে কম. কানু সান্যাল, সৌরীন বোস সহ রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে কম. অসীম চট্টোপাধ্যায় ও কম. অসিত সিনহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অন্ধ্রের কমরেডদের 'পার্বতীপুরম বন্দীমুক্তি কমিটি'র সাথে এখানেও কমিটি গঠন করে আন্দোলন পরিচালনা করেন।

জেলে কম. কানু সান্যাল, কম. অসিত সিনহা O.C.O.R. গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। পরে ১৯৮৫ সালে দার্জিলিং জেলার গঠিত হলে COI(M.L) কম. অসিত সিনহা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন।

বিপ্লবী চেতনা অটুট রাখতে কী জেলে কী বাইরে মতাদর্শগত আলোচনায় ক্লান্তিবিহীনভাবে, ধৈর্য সহকারে আন্তরিক আলোচনায় কোন খামতি ছিল না।

আমরা একজন প্রিয় কমরেডকে হারালাম তাই নয়, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষরা তাঁদের মুক্তির দিশা দেখাবার মানুষকে হারালেন। এমন প্রচারবিমুখ, রাজনৈতিক সচেতন, সৎ মানুষ আজকের দিনে পাওয়া দুর্লভ। কম. অসিত সিনহা আমদের মনে উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো জেগে থাকবেন। কমরেড অসিত সিনহা অমর রহে।

বার্ষিক সূচি : ২০১৪

সম্পাদকীয়/ঘটনাপ্রবাহ/পত্রপত্রিকা থেকে/বিতর্ক

অর্জিত অধিকার, অর্পিত অধিকার/সম্পাদকীয়/৩/জানু-ফেব্রু
গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও নেপালের বামপন্থীরা/শ্যাম শ্রেষ্ঠা/১২/ঐ
পার্টি বিভাজনের ফলে.../জোহান পিটার অ্যান্ডারসন/১৬/ঐ
মূল্যবৃদ্ধি : অন্য চোখে/মানস/২৩/ঐ
আম আদমি পার্টি/মুনমুন/২৫/ঐ
দেবযানী উপাখ্যান : ভারত-মার্কিন সংঘাত/সুদীপ্ত সেন/২৯/ঐ
একটি দাঙ্গার রাজনীতি.../তড়িৎ চৌধুরী./৩৩/ঐ
লুমটেক্স জুটমিলে শ্রমিক সংগ্রামের.../গৌতম চৌধুরি/৩৬/ঐ
নিষ্ফলা নির্বাচন/সম্পাদকীয়/১/মার্চ
দ্বিতীয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ/সুচরিতা সেন/৩/ ঐ
আর্থিক সংস্কার.../অপরাজিতা মুখার্জী/৫/ঐ
ডেপুটেশনেও ভয়? কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়/ ৭ /ঐ
পস্কো আন্দোলন : কোন পথে?/প্রদীপ রায়/৮/ঐ
ডাঃ সমীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে.../৯/ঐ
নির্বাচন— আমজনতার মারীচদশা/সম্পাদকীয়/১/এপ্রিল
ভারত-রাশিয়া পরমাণু চুক্তি/সমরেশ মিত্র/১৪/ ঐ
কৃষিতে নয়া আক্রমণ/সহদেব মণ্ডল/১৫/ ঐ
অন্যায় যারা সহে/তড়িৎ চৌধুরী/১৬/ ঐ
নির্বাচন ও অতঃপর/সম্পাদকীয়/১/মে
লোকসভা নির্বাচন ও আম জনতা/সমরেশ মিত্র/২/ঐ
ভোটে টাকার খেলা!/শ্যামল দাস/৩/ঐ
সারদা-সিবিআই-ন্যায়দণ্ড/সঞ্জয় বসু/৪/ঐ
বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ/সম্পাদকীয়/১/জুন
ব্রাজিল, ফুটবল ও জনবিক্ষোভ/সুচরিতা সেন/২/ঐ
তুমি আমার লোক.../তড়িৎ চৌধুরি/৪/ঐ
বামপন্থার মুক্তি/সম্পাদকীয়/১/জুলাই
হত্যা, ধর্ষণ এবং/সহদেব মন্ডল/২/ঐ
কেউ কলা খায়নি/মালবিকা মিত্র/৩/ঐ
নিষ্ফলা নির্বাচন/পাঠকের কলমে/৪/ঐ
মাননীয় বিচারপতি.../সম্পাদকীয়/১/আগস্ট
গাজায় হত্যালীলা/সমরেশ মিত্র/২/ঐ
পাট-চিত্র/অরিজিৎ/৭/ঐ
উত্তরের চা-বাগান/সুমন গোস্বামী/১০/ঐ
এস্এস্সি প্রার্থীদের অনশন চলছে/সুতনয়া/১২/ঐ
অক্ষরধাম মামলার রায়/সুমন কল্যাণ মৌলিক/১৩/ঐ
বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন.../সম্পাদকীয়/১/সেপ্টে-অক্টো
ইতিহাসচর্চা ও সন্ত্রাসবাদ/সিদ্ধার্থ গুহ রায়/৫/ঐ
উটের নাক হইতে সাবধান/মানস/৬/ঐ
এই রাজ্যে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন/অলীক/৮/ঐ
কিন্তু পেটের খিদে যে বড্ড বেয়াড়া/সব্যসাচী গোস্বামী/১১/ঐ
ঘনীভূত বিপদ/সম্পাদকীয়/১/নভেম্বর
অক্সফ্যাম রিপোর্ট/মানস/ ২/ঐ
বেসরকারিকরণের বেহিসেবি.../সমরেশ মিত্র/৪/ঐ
সব চরিত্র বাস্তব/পরিচয় কানুনগো/৬/ঐ
শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর/সম্পাদকীয়/১/ডিসেম্বর
মোবাইল টাওয়ার: এক চলমান বিপদ/অচ্যুত সেনগুপ্ত/২/ঐ
মোবাইল টাওয়ার বিরোধী আন্দোলনের.../সুব্রত চৌধুরী/৫/ঐ
আরব বসন্তের অবসান.../তড়িৎ চৌধুরী/৯/ঐ
কোরপান হত্যা...কিছু অচেনা প্রশ্ন/রাতুল/৩৫/ঐ

প্রবন্ধ

মানবাধিকারের রাজনীতি/দীপংকর চক্রবর্তী/৪৮/জানু-ফেব্রু
শাসিতের অধিকার, শাসকের অধিকার/শুভেন্দু দাশগুপ্ত/৫৫/ঐ
মানবাধিকার ও শ্রেণী রাজনীতি/রতন খাসনবিশ/৬০/ঐ
সমাজতন্ত্রে মানুষের অধিকার/শ্যামল দাস/৬৬/ঐ
মিডিয়া, জনস্বার্থ ও জনাধিকার/বিপ্লব রায়/৭০/ঐ
ভিন্নমত ও বিদ্রোহের অধিকার/ সমরেশ মিত্র/৭৬/ঐ
শ্রম-শ্রমিক-শ্রমিক আন্দোলন/কুশল দেবনাথ/৮১/ঐ
ভূমিজীবী মানুষের ভূমি অধিকার/প্রণব দে/৮৪/ঐ
মানুষের বন : বনের মানুষ/সুমন গোস্বামী/৮৮/ঐ
ভারত, শ্রীলংকা এবং যুদ্ধাপরাধের.../ডঃ ভি সুরেশ/ ৯১/ঐ
কোন অধিকারে?/সুচরিতা সেন/ ৯৪/ঐ
ভারতীয় সংবাদপত্র.../সুমন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়/১০/মার্চ
ধর্ষকদের নয়, .../সঞ্জীব আচার্য/১১/ঐ
সুন্দরবন থেকে বঙ্গোপসাগর/আনু মুহাম্মদ/১৪/ঐ
শিক্ষায় অরাজকতা/সমরেশ মিত্র/১৬/ঐ
মহাকাশ গবেষণা.../শুভাশিস মুখোপাধ্যায়/২১
দক্ষিণ এশিয়া: রাষ্ট্রের আধিপত্য.../আনু মুহাম্মদ/ ৩/এপ্রিল
স্বাস্থ্যনীতি,ওষুধ কোম্পানির মুনাফা.../শুভজিৎ বসাক/১৯/ঐ
জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা.../বদরুদ্দীন উমর/২১/ঐ
হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইন/দীপঙ্কর দে/২৪/ ঐ
সুলা গায়েন/মনোহর মৌলি বিশ্বাস/৩৫/ঐ
ভারতের মানচিত্র পুনর্নির্মাণ/ গোপাল কৃষ্ণ/৭/মে
মার্কেজ-এর রাজনীতি.../সুনন্দন চক্রবর্তী/১০/ঐ
আমার কালের কথা/বনবিহারী চক্রবর্তী/১২/ঐ
হাজার বছরের কৃষক বিদ্রোহ ও মুর্শিদাবাদ/অরূপ চন্দ্র/২০/ঐ
হিন্দমোটরে সাসপেনশন.../আভাষ মুন্সী/৫/জুন
মোদির ভারতবর্ষ/রতন খাসনবিশ/২৮/ঐ
ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন/অরিজিৎ/৭/ঐ
সংসদীয় নির্বাচন ও গণতন্ত্র/পার্থ সারথি/১৫/ঐ
গুজরাট মডেল/সুমন কল্যাণ মৌলিক/১৯/ঐ
জনসংঘ থেকে বিজেপি/সমরেশ মিত্র/২৩/ঐ
মোদির বাজেট/রতন খাসনবিশ/৫/জুলাই
"সুদিন" আসছে/পরিচয় কানুনগো/৭/ঐ
কৃষি জ্ঞান-উদ্যোগ, জনস্বাস্থ্য/সমরেশ মিত্র/১১/ঐ
বিশ্বশক্তির নতুন খেলা/দারা-শুকো/১৫/ঐ
জমি এবং পর্বান্তর/গোর্কি চক্রবর্তী,অশোক কুমার রায়/২৪/ঐ
রহস্যোপন্যাস নয়/গৌতম চৌধুরী/১৬/আগস্ট
শকুনির উত্তরাধিকার/মানস/২০/ঐ

বিবেকানন্দের নারী ভাবনা/এষা বসু/২২/ঐ
বিপ্লবীর 'বাবু'-দর্শন ও প্রসঙ্গত/অশোক চট্টোপাধ্যায়/৩২/ঐ
ভারতবর্ষের মোদীকরণ.../সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়/১৪/সেঃ-অক্টো
বামপন্থা ও ক্ষমতার রাজনীতি/রতন খাসনবিশ/২১/সেঃ-অক্টো
ছোট আন্দোলন.../শুভেন্দু দাশগুপ্ত/২৮/ঐ
আন্দোলন, সংগঠন ও রাজনীতি/সুচরিতা সেন/৩৩/ঐ
বিগত দু দশকে ভারতে গণ আন্দোলনের...সুকান্ত রায়/৩৬/ঐ
শ্রমজীবী আন্দোলন ও কিছু প্রশ্ন/নব দত্ত/৪৭/ঐ
ভারতের শহরের বুকে শ্রেণী সংগ্রাম/পার্থ সারথি রায়/৫৬/ঐ
ভারতে ভূমি-বিদ্রোহ- বিস্তার এবং সীমাবদ্ধতা/প্রণব দে/৬১/ঐ
নিউক্লিয়ার-বিরোধী আন্দোলন.../সমরেশ মিত্র/৬৭/ঐ
...প্রতিরোধে পসকো প্রকল্প/সন্দীপ কুমার পট্টনায়ক/৭৬/ঐ
গুড়গাঁও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলন/অমিত/৮৫/ঐ
নিয়মগিরি সংগ্রামের গুরুত্ব/ ফেলিক্স পেডাল/৯০/ঐ
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ:১০০ বছর পর/সহদেব মন্ডল/৮/নভেম্বর
একটি গণহত্যার তিরিশ বছর/ তড়িৎ চৌধুরি/৯/ঐ
#হোক কলরব/অরিজিৎ/১১/ঐ
শ্রম আইন সংশোধন প্রসঙ্গে/কুশল দেবনাথ/১৬/ঐ
ভারত রাষ্ট্রে শ্রম আইন/ কৌশিক ভট্টাচার্য্য/১৯/ঐ
মার্কিন রোষানলে ভারতীয় ওষুধশিল্প/ প্রদীপ রায়/২০/ঐ
ঠিকাশ্রমিক ও কয়লাশিল্পের কথা/ প্রশান্ত হালদার /২২/ঐ
তেজোময় ভারত/দারা-শুকো/২৮/ঐ
...ভারতে কৃষি-সম্পর্কের পরিবর্তন/প্রণব দে/৩৫/ঐ
যুদ্ধ, শাস্তি থেকে রেহাই.../ গৌতম নভলখা/১১/ডিসেম্বর
... পুঁজিবাদ— ইবোলা: একটি কেস স্টাডি/সমু/২১/ঐ
আফস্পা যদি 'বিবেকী' হয়ে ওঠে/ গৌতম/৩০/ঐ

কবিতা

কথা, শুধু কথা/সব্যসাচী দেব/৪/জানু-ফেব্রু
রাজকাহিনী/বিশ্বনাথ গরাই/৪/ঐ
কত দূরে যাবে?/বিশ্বজিৎ মিত্র/৪/ঐ
ছড়া/সৃজন সেন/৫/ঐ
লিমেরিক/অশোক চট্টোপাধ্যায়/৫/ঐ
পাজি ছড়া/অচিন্ত্য সুরাল/৬/ঐ
আদিবাসী/বিষাণ রুদ্র/৬/ঐ
পূর্ণিমা মধ্যরাত/বিষাণ রুদ্র/ ৬
হাসো হাসো শিগগিরি হাসো/রঘুবীর সহায়/অনুবাদ/৭/ঐ
সংকল্প/সৃজন সেন/৩৯/ঐ
গান: কমলেশ পাল/সুর ও স্বরলিপি/ভাস্বতী ঘোষ/১০/ঐ
মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতা/ পুনর্মুদ্রণ/৮/ঐ
সিন্দুর/বিশ্বজিত সেন/১০/জুন
চাঁদ পোড়ে/অজয় সেন/১০/ঐ
বন্ধু সহযোদ্ধা কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী/জয়ন্ত বিশ্বাস/১০/ঐ
অট্টহাসি/শঙ্খ ঘোষ/১৬/ সেপ্টে-অক্টো
শ্রীনগরে একটি রাত/সব্যসাচী দেব/১৬/ঐ
জাল/বিশ্বনাথ গরাই/১৬/ঐ
ভোরের সূর্য/অশোক চট্টোপাধ্যায়/১৭/ঐ

বিসর্জনের বেলা/অজয় সেন/১৭/ঐ
ছড়া/সৃজন সেন/১৮/ঐ
পরিবর্তন/সব্যসাচী গোস্বামী/১৮/ঐ
আগুনখেলা/অচিন্ত্য সুরাল/১৯/ঐ
অনুব্রতী/অমিত রায়/১৯/ঐ
কবিতার জন্য/ সোমা/২০/ঐ
ভরাট/অরূপ চন্দ/২০/ঐ
অরণ্যা/ গৌতম সরকার/২০

গল্প

এভাবেই শুরু হয়/দীপঙ্কর দাস/৪০/জানু-ফেব্রু
মধু দেয়াসির বৌ/কানন ঘোষ/৪৫/ঐ
পিতৃতন্ত্র/রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়/১১২/ সেপ্টে-অক্টো
বাবার সেই পরিত্যক্ত জমি/মীনাক্ষী সেন/১১৬/ঐ
মহাভারত/বিশ্বজিৎ রায়/১২১/ঐ

স্মরণ

নেলসন ম্যান্ডেলা:/শুচিব্রত সেন/১৯/জানু-ফেব্রু
অভী দত্ত মজুমদার/৩৯/ঐ
পিট সিগার/১০০/ঐ
মণিভূষণ ভট্টাচার্য স্মরণে/সব্যসাচী দেব/২৯/মার্চ
পিট সিগার-এর গান/গণবিষাণ/৩৭/এপ্রিল
বনবিহারী চক্রবর্তী/৪০/ ঐ
খালেদ চৌধুরী স্মরণে/সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়/৬/ মে
প্রদীপ (খোকন) চ্যাটার্জী/ভারতজ্যোতি রায় চৌধুরী/প্রচ্ছদ ৩/ঐ
সুনীতি কুমার ঘোষ/শুভাশিস মুখোপাধ্যায়/৩১/জুন
অমলেন্দু দে/সুস্নাত দাশ/৩৪/ঐ
নির্মলদাকে নিয়ে কথা.../শুভেন্দু দাশগুপ্ত/৩৭/ঐ
সুশীল রায়/অপূর্ব/৩৩/জুলাই
সুকুমারী ভট্টাচার্য/গার্গী/৩৪/ঐ
একটি মানুষের ...কাহিনী/শুভাশিস মুখোপাধ্যায়/৩৭/ঐ
সরোজ দত্ত স্মরণে/সমরেশ মিত্র/৩০/আগস্ট
নবারুণ স্মরণে/মীনাক্ষী সেন/৩৯/ঐ
বিপন চন্দ্র:১৯২৮-২০১৪/শমিতা সরকার/১৩১/ সেপ্টে-অক্টো
নবারুণ ভট্টাচার্য/সুনন্দন চক্রবর্তী/১৩২/ঐ
...কমিউন আর হলো না মীনাক্ষী/কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়/৩৭/ডিসে
এক বিবেকী বিচারকের প্রয়াণ/সিদ্ধার্থ গুহরায়/৪০/ঐ

গ্রন্থ সমালোচনা

কলকাতার পুকুর/অরিজিৎ/৩৩/মার্চ
মুর্শিদাবাদ: দুয়ার হতে দূরে/ দেবরাজ চক্রবর্তী/৩৭/ঐ
গদ্যসংগ্রহ : অমলেন্দু চক্রবর্তী/শুচিব্রত সেন/৩৯/জুলাই
কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা.../ সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত/৩৩/ডিসেম্বর

সাক্ষাৎকার

মেধা পাটকর/৯২/ শোভনলাল দত্তগুপ্ত/ ৯৬/
সত্যব্রত চক্রবর্তী/১০১/গুরুদাস দাশগুপ্ত/১০৭
দেবাঞ্জন চক্রবর্তী/১০৯/ সেপ্টে-অক্টো